সাধনার মনোভূমি

ভগবত্তত্ত্ব

(বাসুদেবঃ সর্বম্)

ভগবত্তত্ত্ব বা পরমাত্মতত্ত্ব হল সেই তত্ত্ব যাতে কখনো বিন্দুমাত্রও কোনো বিকার অথবা পরিবর্তন হয় না, সমস্ত ঘটনা প্রভৃতিতে যা সমানরূপে পরিপূর্ণ, যা সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ এবং যা জীবমাত্রের প্রকৃত স্বরূপ। সেই তত্ত্বই নির্গুণ-নিরাকার হলে 'ব্রহ্ম', সগুণ-নিরাকার হলে 'পরমাত্মা' আর সগুণ-সাকার হলে 'ভগবান' নামে কথিত হয়—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১১)

ওই একই তত্ত্ব সংসারে বহু রূপে আভাসিত হয়। যেমন, সোনার তৈরি গয়নার নাম, আকৃতি, ব্যবহার, ওজন এবং মূল্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং সেগুলির উপর মিনা করা থাকলে রংও আলাদা হয়, কিন্তু এত কিছু হলেও স্বর্ণতত্ত্বে কোনো প্রভেদ হয় না, তা যেমনকার তেমনই থেকে যায়। সেই রকমই যা কিছু দেখা, শোনা এবং জানা যায় সেই সব কিছুর মূলে একই পরমাত্মতত্ত্ব বিদ্যমান। এই অনুভূতিকেই গীতা 'বাসুদেবঃ সর্বম্' বলেছে (৭।১৯)।

এই তত্ত্বকে প্রাপ্তির জন্য সংসারে তিনটি যোগকে প্রধান মানা হয়েছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। কর্মযোগে সাধক কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবত্তত্ত্বকে পেয়ে যান—

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে। (গীতা ৪।২৩)

গ্রন্থটি তারই নির্বাচিত দশটি রচনার বঙ্গানুবাদ।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ঈশ্বর প্রাপ্তিতে মন এক বড় বাধা। তাই মনের ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়াস মানুষের কাছে এক আবশ্যিক কর্তব্য। আমি যে মন নই, এই অনুভূতি থেকেই মনের ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়াস শুরু করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ এর জন্য চারটি পথ পরিক্রমার কথা বলেছিলেন। সেগুলি হল—

এক, চিন্তাকে লক্ষ্য করো। অর্থাৎ নিজেকে চিন্তা থেকে সরিয়ে আনো।

দুই, চিন্তাগুলিকে পরীক্ষা করো। নিজেকে বিচারকের আসনে বসিয়ে ভালো-মন্দ চিন্তাকে চিহ্নিত করো।

তিন, চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করো। নিজেকে প্রহরীর আসনে বসিয়ে মন্দ চিন্তার অগ্রগতিকে রোধ করো।

চার, চিন্তার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করো। অর্থাৎ এমন অবস্থায় পৌঁছে যাও যাতে মন্দ চিন্তার উদ্রেক না হয়।

বস্তুত চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনাই অধ্যাত্ম সাধনার মনোভূমি।

বিজয়া দশমী ১৪১১ **ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**

সূচিপত্র

যোগযুক্ত মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥ (গীতা ৫।৬)

জ্ঞানযোগে সাধক পরমাত্মাকে তত্ত্বত জেনে তাতে প্রবিষ্ট হয়ে যান—

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্। (গীতা ১৮।৫৫)

ভক্তিযোগে সাধক অনন্য-ভক্তির দ্বারা ভগবানকে তত্ত্বত জেনে নেন, তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন এবং তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যান। গীতায় ভগবান বলেছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপঃ॥ (১১।৫৪)

সাধক তাঁর নিজের রুচি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতানুসারে যোগমার্গে, জ্ঞানমার্গে বা ভক্তিমার্গে সাধনা করুন না কেন অন্তিমে সাধক সেই একই তত্ত্ব লাভ করেন। সেই এক তত্ত্বই শাস্ত্রে বিভিন্ন নামে বর্ণিত হয়েছে। সেই তত্ত্বকে অনুভব করার পর আর কোনো কিছুই করা, জানা এবং পাওয়া বাকি থাকে না।

যদি সাধক এই বিষয়টি বুঝতে পারেন তাহলে উপরোক্ত যে কোনো মার্গেই ভগবত্তত্ত্ব বা পরমাত্মতত্ত্ব খুব সহজেই পেয়ে যান।[১] তার

---

[১]কর্মযোগের দ্বারা সহজেই তত্ত্বপ্রাপ্তি—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎপ্রমুচ্যতে॥ (গীতা ৫।৩)

'হে মহাবাহো ! যে মানুষ কাউকে দ্বেষ করে না এবং কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে না সেই কর্মযোগী সর্বদা সন্ন্যাসী বলে মান্য। কেননা দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সুখপূর্বক সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।'

জ্ঞানযোগের দ্বারা সহজেই তত্ত্বপ্রাপ্তি—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ (গীতা ৬।২৮)

'নিজে থেকে নিজেকে সর্বদা পরমাত্মায় নিয়োজিত করে পাপরহিত যোগী

কারণ পরমাত্মা সব দেশ, কাল, পাত্র, বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতিতে যেমনকার, তেমনভাবেই বিদ্যমান। তিনি কোথাও কখনো অবিদ্যমান হন না। এইজন্য স্বতঃসিদ্ধ, নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিতে কঠিনতার প্রশ্ন নেই। নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার প্রাপ্তিতে কাঠিন্য প্রতীত হওয়ার প্রধান কারণ হল—সাংসারিক সুখের ইচ্ছা। এইজন্যই সাধক সংসারের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নেন এবং পরমাত্মার প্রতি বিমুখ হয়ে যান। সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্বন্ধের কারণেই সাধক নিত্যপ্রাপ্ত ভগবত্তত্ত্বকে অপ্রাপ্ত মনে করে তার প্রাপ্তিকে পরিশ্রমসাধ্য এবং কঠিন বলে মান্য করেন। বাস্তবে ভগবত্তত্ত্ব প্রাপ্তিতে কঠিনতা নেই। কঠিনতা আছে সংসারকে ত্যাগ করায়, যা নিরন্তর আমাদের ত্যাগ করছে। অতএব ভগবত্তত্ত্বকে সহজে অনুভব করার জন্য সংসারের সঙ্গে যে সম্বন্ধ মেনে নেওয়া হয়েছে এখনই তার বিচ্ছেদ অনুভব করা অত্যাবশ্যক। আর এ তখনই সম্ভব যখন সম্পর্কজনিত সুখলাভের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করা হবে।

তত্ত্ব-দৃষ্টিতে পরমাত্মতত্ত্ব ছাড়া অন্য কিছুই নেই—এই জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর মানুষ আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয় না। ভগবান বলেছেন—

সুখপূর্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অতীব সুখ লাভ করেন।'

ভক্তিযোগের দ্বারা সহজেই তত্ত্বপ্রাপ্তি—

অনন্যচেতাঃ যততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ (গীতা ৮।১৪)

'হে পার্থ! অনন্যচিত্তবিশিষ্ট যে মানুষ আমাকে সদাসর্বদা স্মরণ করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর কাছে আমি সুলভ অর্থাৎ সে সহজেই আমাকে পেয়ে যায়।'

(এই বিষয়টি বিষদরূপে জানার জন্য গীতা প্রেস থেকে প্রকাশিত 'গীতা দর্পণ' গ্রন্থের 'গীতায় তিনটি যোগের একত্ব' শীর্ষক লেখাটি দ্রষ্টব্য।)

যজ্‌জ্ঞাত্বাং ন পুনর্মোহমেবং যাস্যাসি পাণ্ডব। (গীতা ৪।৩৫)

'যাকে জানার পর তুমি এই রকম মোহগ্রস্ত হবে না।'

ওই তত্ত্বই সংসাররূপে আভাসিত হচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেদিকে দৃষ্টি না যায় ততক্ষণ কেবল সংসারই দৃষ্ট হয়, তত্ত্ব দৃষ্ট হয় না। যেমন, যতক্ষণ 'এটি গঙ্গা'—এইদিকে দৃষ্টি না যায় ততক্ষণ সেটিকে সাধারণ নদী বলেই মনে হবে। পরমাত্মতত্ত্বকে তত্ত্বদৃষ্টিতেই দেখা যেতে পারে।

তিন প্রকারের দৃষ্টি

মানুষের দৃষ্টি তিন প্রকারের—**(১) ইন্দ্রিয়দৃষ্টি (বাহ্যিক)**[১], **(২)** বুদ্ধিদৃষ্টি (আন্তরিক)[২] এবং তত্ত্বদৃষ্টি (স্বরূপ)[৩]—এই তিনটি দৃষ্টি ক্রমশ পরস্পর সূক্ষ্মতম এবং শ্রেষ্ঠ।

সংসার অ-সৎ ও অস্থির হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতে দেখলে তাকে সৎ এবং স্থির বলে মনে হয়। তাতে সংসারের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিদৃষ্টিতে বিবেকই প্রধান। যখন বুদ্ধিতে ভোগ (ইন্দ্রিয় এবং তার বিষয়গুলি)-এর প্রাধান্য থাকে না বরং বিবেকেরই প্রাধান্য থাকে তখন বুদ্ধিদৃষ্টিতে সংসার পরিবর্তনশীল এবং উৎপন্ন ও বিনাশশীল দৃষ্ট হয়, তাতে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে।

জড়-চেতন, নিত্য-অনিত্য, সৎ-অসৎ প্রভৃতি বস্তুগুলি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানকেই 'বিবেক' বলা হয়। এই বিবেক সকল প্রাণীর

---

[১] যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ (গীতা ১৮।২২)

[২] সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ (গীতা ১৮।২০)

[৩] বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (গীতা ৭।১৯)

মধ্যেই স্বত বিদ্যমান। পশু-পক্ষীর মধ্যে শরীর নির্বাহের পক্ষে উপযোগী (খাদ্য-অখাদ্যের) বিবেক থাকে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই বিবেক বিশেষ রূপে জাগ্রত থাকে। বিবেক অনাদি। ভগবান বলেন—

'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।' (গীতা ১৩।৩৯) 'প্রকৃতি এবং পুরুষ—এই দুটিকেই তুমি অনাদি বলে জান।'

এই শ্লোকার্ধের উল্লিখিত 'উভৌ' (উভয়) পদ থেকে এটি সিদ্ধ হয় যে প্রকৃতি এবং পুরুষ দুটিই যেমন অনাদি, তেমনই এই দুটির ভেদ জ্ঞানরূপ বিবেকও অনাদি। **'উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥'** (গীতা ২।১৬), তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষেরা সৎ-অসৎ দুটি তত্ত্বই দেখেছেন—এই শ্লোকার্ধে উল্লেখিত **'উভয়োঃ'** পদ থেকেও এটিই সিদ্ধ হয়।

যেমন আলো বাল্বে নেই, কিন্তু তা বাল্বে আসে অর্থাৎ আলো বাল্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। সেইভাবে এই অনাদিসিদ্ধ বিবেকও বুদ্ধিতে সৃষ্টি হয় না, তবে তা বুদ্ধিতে আসে। ইন্দ্রিয় দৃষ্টি অপেক্ষা বুদ্ধিদৃষ্টিকে গুরুত্ব দিলে বিবেক বিশেষভাবে স্ফুরিত হয়, যার ফলে সৎ-এর অস্তিত্ব এবং অসৎ-এর অবিদ্যমানতার জ্ঞান স্পষ্টরূপে হয়ে যায়। বিবেকের দ্বারা অ-সৎকে ত্যাগ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে সেইটিই হল তত্ত্ব। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখলে ভগবত্তত্ত্ব অথবা পরমাত্মতত্ত্ব ছাড়া সংসার, শরীর, অন্তঃকরণ, বাহ্যিক প্রভৃতি কোনো কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা সত্যরূপে বিন্দুমাত্রও থাকে না। তখন কেবল **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**—সব কিছুই বাসুদেব এই জ্ঞান হয়ে যায়।

এইভাবে এই সংসার বাহ্যিকভাবে (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) দেখলে নিত্য এবং সুখদায়ী, অন্তঃকরণ (বুদ্ধি)-এর দ্বারা দেখলে অনিত্য এবং দুঃখদায়ী আর তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখলে পরমাত্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়।

সাধকের বিবেকদৃষ্টি এবং সিদ্ধপুরুষের তত্ত্বদৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য হল এই যে বিবেকদৃষ্টিতে সৎ এবং অসৎ-কে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখা হয়

এবং সৎ-এর অবিদ্যমানতা নেই এবং অসৎ-এর অস্তিত্ব নেই এই বোধ হয়। এইভাবে বিবেকদৃষ্টির পরিণাম হল অসৎ-কে ত্যাগপূর্বক সৎ-এর প্রাপ্তি। সৎ-এর প্রাপ্তিতে তত্ত্বদৃষ্টিই বিদ্যমান থাকে। তত্ত্বদৃষ্টিতে সংসার কখনো সত্যরূপে প্রতীত হয় না। তাৎপর্য হল বিবেকদৃষ্টিতে সৎ এবং অসৎ-দুটিই থাকে, কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে কেবল সৎ থাকে।

বিবেকের প্রতি গুরুত্ব দিলে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান লীন হয়ে যায় এবং বিবেকের ঊর্ধ্বে যে বাস্তবিক তত্ত্ব আছে সেখানে বিবেকও লীন হয়ে যায়।

বাস্তবিক দৃষ্টি—বস্তুত তত্ত্বদৃষ্টিই হল বাস্তবদৃষ্টি। ইন্দ্রিয়দৃষ্টি আর বুদ্ধিদৃষ্টি বাস্তব নয়। কেননা এই সংসার যে ধাতু দিয়ে তৈরি দৃষ্টিগুলিও সেই ধাতুরই । সেজন্য এই দৃষ্টিগুলি সাংসারিক ও পারমার্থিক বিষয়গুলি সম্পর্কে পূর্ণ নির্ণয় করতে পারে না। তত্ত্বদৃষ্টির মধ্যে এই দৃষ্টিগুলি লীন হয়ে যায়। যেমন রাত্রিতে বাল্ব জ্বালালে আলো হয়ে যায় কিন্তু সেই বাল্বকেই যদি দিনের বেলায় (দিনের আলোয়) জ্বালানো হয় তাহলে তাতে আলোর আভাস থাকলেও সেই আলোয় (সূর্যের আলোর সামনে) কোনো গুরুত্ব থাকে না। তেমনই ইন্দ্রিয়দৃষ্টি এবং বুদ্ধিদৃষ্টি অজ্ঞান (অবিদ্যা) অথবা সংসারে কাজ করে কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টি হয়ে যাবার পর এই দৃষ্টিগুলির তার (তত্ত্বদৃষ্টির) কাছে কোনো গুরুত্ব থাকে না। এই দৃষ্টিগুলির বিনাশ হয় না তবে ওইগুলি প্রভাবহীন হয়ে যায়। কেবল সচ্চিদানন্দরূপে একটি জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে। তাকেই ভগবত্তত্ত্ব বা পরমাত্মতত্ত্ব বলা হয়। ওইটিই বাস্তবিক তত্ত্ব। বাকি সব অ-তত্ত্ব।

সাধ্যতত্ত্বের একরূপতা

যেমন চোখ এবং চোখ দিয়ে দেখার দৃশ্য দুটিই সূর্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেইরকম বহিঃকরণ অন্তঃকরণ, বিবেক প্রভৃতি সব কিছুই সেই

পরম প্রকাশক তত্ত্বের দ্বারা প্রকাশিত হয়—**'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'** (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৬।১৪)। যা বাস্তবিক প্রকাশ অথবা তত্ত্ব সেইটিই সকল দর্শনের আধার। প্রায় সকল দার্শনিকেরই লক্ষ্য সেই তত্ত্ব লাভ করা। দার্শনিকদের বর্ণনা-শৈলী তথা সাধন পদ্ধতিগুলি ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য একই। সাধকদের মধ্যে রুচি, বিশ্বাস, যোগ্যতার পার্থক্য হেতু তাঁদের সাধনায় ভেদ হয়ে যায়, কিন্তু তাঁদের সাধ্যতত্ত্ব বস্তুত একই হয়ে থাকে।

নারায়ণ অরু নগরকে, রজ্জব রাহ অনেক।
ভাবে আবো কিধরসে। আগে অহ্নল এক॥

দিশার বিভিন্নতার জন্য শহরে প্রবেশের ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকে। শহরে কেউ উত্তর দিক থেকে, কেউ বা দক্ষিণ, কেউ বা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিক থেকে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই একটি জায়গাতেই পৌঁছে যায়। এই রকম সাধকদের স্থিতির ভিন্নতার কারণে সাধন মার্গে পার্থক্য থাকলেও সাধকেরা অন্তিমে একটি তত্ত্বই লাভ করেন। তাই সাধুরা বলেছেন—

পহুঁচে পহুঁচে এক মত, অনপহুঁচে মত ঔর।
সন্তদাস ঘড়ী অরঠকী, ঢুরে এক হী ঠৌর॥

প্রত্যেক মানুষেরই খাদ্য-রুচির বিষয়ে অন্যের সঙ্গে পার্থক্য থাকে। কিন্তু 'ক্ষুধা' এবং তৃপ্তি সকলের সমান হয়ে থাকে। সেই রকমই মানুষের বেশভূষা, চলা, বসা, ভাষা প্রভৃতিতে অনেক পার্থক্য থাকে। কিন্তু 'কান্না' এবং 'হাসি' সকলের একরকমই হয়ে থাকে, অর্থাৎ সুখ-দুঃখের অনুভূতি সকলেরই একই রকমের হয়। এমন হয় না যে এই কান্না বা হাসি হল মারওয়াড়ি, ওইটি হল গুজরাটি এবং আর এটি বাঙালি। এই রকমই সাধন-পদ্ধতিতে ভিন্নতা থাকলেও 'সাধ্যকে না পাওয়ার দুঃখ' এবং 'প্রাপ্তির আনন্দ' সকল সাধকের সমান হয়।

এই পরমাত্মতত্ত্বই ব্রহ্মরূপে সকলকে সৃষ্টি করে, বিষ্ণুরূপে

সকলকে পালন করে এবং রুদ্ররূপে সকলকে সংহার করে—'**ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ**॥' (গীতা ১৩।১৬) সেই তত্ত্বই অনেক অবতারের রূপ পরিগ্রহ করে বিভিন্ন রূপে লীলা করে। এইভাবে অনেক রূপে দৃষ্ট হলেও সেই তত্ত্ব বাস্তবে একই থাকে এবং তত্ত্বদৃষ্টিতে একই দৃষ্ট হয়। এই তত্ত্বদৃষ্টির প্রাপ্তিকেই দার্শনিকেরা মোক্ষ, পরমাত্মপ্রাপ্তি, ভগবৎপ্রাপ্তি, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি নাম দিয়েছেন।

সহজ-নিবৃত্তিরূপ বাস্তবিক তত্ত্ব

সংসারে প্রবৃত্তি (করা) আছে আবার নিবৃত্তি (না-করা)ও আছে। যার আদি এবং অন্ত আছে তাকে ক্রিয়া অথবা অবস্থা বলা হয়। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুটিই ক্রিয়া অথবা অবস্থা। তাৎপর্য হল, প্রবৃত্তি যেমন ক্রিয়া, নিবৃত্তিও তেমনই ক্রিয়া। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে এবং নিবৃত্তি প্রবৃত্তিকে জন্ম দেয়। ক্রিয়া এবং অবস্থা সবই প্রকৃতির, তত্ত্বের নয়। এই দৃষ্টিতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুটিই প্রকৃতির অন্তর্গত। নির্বিকল্প সমাধি থেকেও 'উত্থান' হয়ে থাকে। অতএব জাগা, চলা, বলা, দেখা, শোনা প্রভৃতির মতন ঘুমানো, বসা, মৌন থাকা, মূর্ছা যাওয়া, সমাধিস্থ হওয়া প্রভৃতিও হল ক্রিয়া অথবা অবস্থা।

অবস্থার অতীত যে অক্রিয় পরমাত্মতত্ত্ব তাতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—দুটিই নেই। অবস্থার পরিবর্তন হয়, কিন্তু সেই তত্ত্বের কোনো পরিবর্তন হয় না। ওই বাস্তবিক তত্ত্ব হল সহজ নিবৃত্তি রূপ। সেই তত্ত্বে সকল মানুষের (স্বরূপত) স্বাভাবিক অবস্থান। সেই পরমতত্ত্ব সকল দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতি, অবস্থা প্রভৃতিতে স্বাভাবিকরূপে যেমনকার তেমনভাবেই বিদ্যমান থাকে। সেইজন্য ওই সহজ নিবৃত্তিরূপ পরমতত্ত্বকে যে যখন খুশি, যেখানে খুশি প্রাপ্ত করতে পারে। প্রয়োজন কেবল প্রাকৃত দৃষ্টির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া।

প্রকৃতির সঙ্গে 'স্বয়ং'-এর মেনে নেওয়া সম্বন্ধকেই 'অহং' বলা হয়। সাধক প্রমাদবশে নিজের বাস্তবিক সত্তাকে (যেখান থেকে 'অহং'

উদিত হয় অথবা যা 'অহং'-এর আধার) ভুলে গিয়ে মেনে নেওয়া 'অহং'-কেই (যা দৃষ্ট হওয়ার পর সত্তাবিশিষ্ট হয়) নিজের সত্তা অথবা নিজের স্বরূপ বলে মনে করে। মেনে নেওয়া 'অহং' পরিবর্তিত হয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব (স্বরূপ) কখনো পরিবর্তিত হয় না। এই মেনে নেওয়া 'অহং'-কে ভগবান এইরূপ বলেছেন, যেমন—**'অহঙ্কার ইতীয়ম্'** (গীতা ৭।৪) এবং **'অপরা ইয়ম্'** (গীতা ৭।৫)। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মেনে নেওয়া 'অহং' থাকে ততক্ষণ সাধকের প্রকৃতির (প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ অবস্থার) সঙ্গে সম্বন্ধ বাঁধা থাকে। আর তাতে সাধক নিবৃত্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এই 'অহং' প্রবৃত্তিতে কার্যরূপে আর নিবৃত্তিতে 'কারণ' রূপে থাকে। 'অহং'-এর বিনাশ হলেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ঊর্ধ্বে যে প্রকৃততত্ত্ব তাতে নিজের স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হয়। তখন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কোনোটিরই সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। এই রকম হলেও প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির বিনাশ হয় না, কিন্তু বাহ্যচিহ্নগুলি নামমাত্ররূপে বিদ্যমান থাকে। এইভাবে প্রকৃত তত্ত্বে নিজের স্বাভাবিক অবস্থানের অনুভূতিকে দার্শনিকরা সহজ নিবৃত্তি, সহজাবস্থা, সহজ সমাধি নামে অভিহিত করেছেন।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া প্রত্যেকটি সম্পর্কের প্রতি মুহূর্তে বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। কারণ এই যে সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সংলগ্নতা হল অস্বাভাবিক আর তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হল স্বাভাবিক। বিচার করলে দেখা যাবে যে সংলগ্ন থাকার সময়েও বিচ্ছেদই থাকে অর্থাৎ সংলগ্নতাই নেই। কিন্তু সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সংলগ্নতায় সদ্‌ভাব (সত্তাভাব) করে নিলে বিচ্ছেদের অনুভূতি হতে পারে না। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে যার সঙ্গে বিচ্ছেদ হচ্ছে সেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ সংসারের স্বতন্ত্র সত্তাই নেই। যেমন বাল্যাবস্থার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে, অতএব এখন আর তার সত্তা

কোথায় ? যেমন বর্তমান কালে অতীত কালের সত্তা নেই তেমনই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালেরও সত্তা নেই। যেখানে অতীত কাল বিগত হয়েছে, সেখানে বর্তমান কালও চলে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যৎকালও সেইখানেই চলে যাবে। এই জন্যই ভগবান গীতায় বলেছেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ (২।১৬)

'অ-সতের সত্তা বিদ্যমান নেই আর সৎ-এর অনস্তিত্ব বিদ্যমান নেই। এই দুটিরই তত্ত্ব জ্ঞানী মহাপুরুষরা দেখেছেন অর্থাৎ অনুভব করেছেন।'

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ সংসার থেকে বিচ্ছেদের অনুভূতি হওয়ার পর সহজ-নিবৃত্তিরূপ প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞান হয়ে যায় এবং যে সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে তার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করলে সেই তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হয়ে যায়।

তত্ত্বপ্রাপ্তির উপায়

তত্ত্বকে লাভ করবার সর্বোত্তম উপায় হল তত্ত্বপ্রাপ্তিকেই একমাত্র উদ্দেশ্য করা। বাস্তবে উদ্দেশ্য সৃষ্টি হয়েছে প্রথমে এবং পরে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মনুষ্য-শরীর পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু মানুষ ভোগে আসক্ত হয়ে নিজের সেই (তত্ত্বলাভ) উদ্দেশ্যকে ভুলে যায়। তাই সেই উদ্দেশ্যকে চিনে নিয়ে সিদ্ধিকে দৃঢ়-নিশ্চয় করতে হবে। উদ্দেশ্য পূর্তির সিদ্ধান্ত যত দৃঢ় হয় ততই তীব্রতার সঙ্গে সাধক তত্ত্বপ্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়। উদ্দেশ্যকে দৃঢ় করার জন্য সর্বপ্রথম সাধককে বহিস্থ (ইন্দ্রিয়দৃষ্টি)-কে গুরুত্ব না দিয়ে অন্তঃকরণ (বুদ্ধি অথবা বিচারদৃষ্টি)-কে গুরুত্ব দিতে হবে। বিচারদৃষ্টিতে দেখা যাবে যে শরীরাদি যত কিছু সাংসারিক পদার্থ আছে সেই সবগুলিই উৎপত্তির আগে ছিল না এবং বিনাশের পরেও থাকবে না এবং বর্তমানে তা নিরন্তর পরিবর্তিত হচ্ছে। তাৎপর্য

হল এই যে সকল পদার্থের আদি এবং অন্ত আছে। যে পদার্থের আদি এবং অন্ত থাকে বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। কেননা সিদ্ধান্ত এইটিই যে, যা আদিতে এবং অন্তে নেই তা বর্তমানেও নেই—**'আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা'** (মাণ্ডূক্যকারিকা)। এইভাবে বিচারদৃষ্টিকে গুরুত্ব দিলে সৎ এবং অসৎ, প্রকৃতি এবং পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান (বিবেক)-এর অনুভূতি হয়ে যায় এবং সাধকের প্রকৃত তত্ত্ব (সৎ)-কে লাভ করবার উদগ্র অভিলাষ জাগ্রত হয়ে যায়। সংসারের সুখ তো নয়ই, সাধনাজনিত সাত্ত্বিক সুখেরও আশ্রয় না নিলে পরম ব্যাকুলতা জাগ্রত হয়। তার ফলে সাধক অ-সৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে যান এবং সেই তত্ত্বদৃষ্টি লাভ করেন। এটি প্রাপ্ত হলে সৎ-তত্ত্ব ভগবত্তত্ত্বের সত্তা অনুভবে এসে যায়।

ব্যবহারের বিবিধ রূপ

সাধারণ (বিষয়ী) মানুষ, বিবেকী (সাধক) মানুষ এবং তত্ত্বজ্ঞ (সিদ্ধ) পুরুষ—তিন জনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। সাধারণ মানুষ সংসারকে সৎ মেনে নিয়ে রাগ-দ্বেষপূর্বক প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তিরূপ ব্যবহার করে থাকে। বিচার দৃষ্টিকে প্রধান বলে মনে করেন যে শ্রেয়তর বিবেকী মানুষ তাঁর ব্যবহার রাগ-দ্বেষরহিত এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে হয়ে থাকে।[১] বিবেকদৃষ্টির প্রাধান্য থাকার কারণে কিছুটা রাগদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও তাঁর (বিবেকদৃষ্টি প্রধান সাধকের) ব্যবহার রাগদ্বেষ পূর্বক হয় না। অর্থাৎ তিনি রাগদ্বেষের বশীভূত হয়ে আচরণ করেন

[১]তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥ (গীতা ১৬।২৪)

'তোমার জন্য কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ। অতএব তুমি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জেনে যা নির্দিষ্ট সেরূপ কর্মের আচরণ করো।'

না।[১] তাঁর মধ্যে রাগ-দ্বেষ খুব কম থাকে—প্রায় না থাকার মতো। অবিবেক যতটুকু থাকে রাগ-দ্বেষও ততটুকু থাকে। বিবেক যেমন যেমন জাগ্রত হয় তেমনই রাগদ্বেষও কম হতে থাকে এবং বৈরাগ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৈরাগ্য বৃদ্ধি পেলে খুবই সুখ লাভ হয়, কেননা দুঃখ তো অনুরাগেই থাকে।[২] পূর্ণবিবেক জাগ্রত হলে রাগ-দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়, বিবেকী পুরুষ সংসারের সত্তাকে দর্পণের প্রতিবিম্বের মতো অ-সৎ রূপেই দেখে। পরে তত্ত্বদৃষ্টি লাভ হয়ে গেলে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সংসারকে স্বপ্নে-র স্মৃতিরূপে দেখেন। এইজন্য বাহ্যিক ব্যবহার একরকম হলেও বিবেকী ও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের ভাবের মধ্যে খুবই পার্থক্য থাকে।

সাধারণ মানুষদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের, সাধক পুরুষদের মধ্যে বিবেক-বিচারের এবং সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে স্বরূপের প্রাধান্য থাকে। সাধারণ মানুষদের রাগ-দ্বেষ বালিতে আঁকা রেখার মতো এবং বিবেক পূর্ণতা লাভ করবার পর তা জলের উপর আঁকা রেখার মতন হয়ে থাকে।

---

[১]ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।। (গীতা ৩।৩৪)

'ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অর্থে অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়তে রাগ-দ্বেষ ব্যবস্থায় স্থিত থাকে। মানুষের ওই দুটির বশীভূত হওয়া উচিত নয়। কেননা ওই দুটিই কল্যাণমার্গে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী মহান শত্রু।'

[২]এই সাধনাজনিত সুখে সন্তোষ অথবা সুখভোগ করা সাধকের উচিত নয়। ভগবান বলেছেন—

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।। (গীতা ১৪।৬)

'হে নিষ্পাপ অর্জুন! এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্ব গুণ নির্মল হওয়ায় তা প্রকাশকারী এবং বিকাররহিত। ওই (সত্ত্বগুণ) সুখের সম্বন্ধের দ্বারা (ভোগ) এবং জ্ঞানসঙ্গের (অহংকারের) দ্বারা সাধককে বেঁধে রাখে।'

তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদের রাগদ্বেষ আকাশে অঙ্কিত রেখার মতো (যেখানে রেখার কোনো দাগ পড়ে না, কেবল আঙুল দেখা যায়)। এর কারণ তাঁর দৃষ্টিতে সংসারের কোনো স্বতন্ত্র সত্তাই নেই।

জ্ঞানীর আচরণের বৈশিষ্ট্য

তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার আগে পর্যন্ত সাধক (অন্তঃকরণকে নিজস্ব মানার কারণে) তত্ত্বে অন্তঃকরণসহ নিজ অবস্থান মানেন। এইরকম অবস্থায় তাঁর বৃত্তিগুলি আচরণ থেকে সরে গিয়ে তত্ত্বমুখী হয়ে যায়। তাই তাঁর সাংসারিক আচরণে ভ্রান্তি ঘটতে পারে। অন্তঃকরণের (জড়তার) সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর জড়-চেতনের সম্বন্ধযুক্ত সূক্ষ্ম 'অহং' সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের স্বরূপে সদাসর্বদা স্বাভাবিক অবস্থান থাকে। এইজন্য সাধনাবস্থায় অন্তঃকরণকে নিয়ে তত্ত্বে তল্লীন হওয়ার ফলে আচরণে যে ভ্রান্তি ঘটতে পারে সেইগুলি সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদের দ্বারা হয় না। তাছাড়া তাঁর আচরণ স্বতঃস্বাভাবিকরূপে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় এবং অপরের কাছে তা আদর্শ হয়ে যায়।[১] তার কারণ হল এই যে অন্তঃকরণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের স্থিতি তো নিজের স্বাভাবিক স্বরূপে অর্থাৎ তত্ত্বে হয় আর অন্তঃকরণের স্থিতি নিজের স্বাভাবিক স্থান—শরীরে (জড়তা) হয়ে যায়। এই রকম অবস্থায় তত্ত্ব তো থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ (তত্ত্বের জ্ঞাতা) থাকে না। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব (অহং) সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। ব্যক্তিত্ব

---

[১]যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতেলোকস্তদনুবর্ততে॥ (গীতা ৩।২১)

'শ্রেষ্ঠ পুরুষ যেসব আচরণ করেন, অন্য পুরুষেরাও সেই রকম আচরণ করেন। তিনি যা কিছু (কথার দ্বারা) প্রমাণ করেন অন্য লোকেরাও সেই মতো আচরণ করে থাকে।'

দূর হয়ে গেলে রাগ-দ্বেষ কে করবে, কার উপর করবে ? যে অন্তঃকরণকে সে নিজস্ব বলে মনে করে সেই অন্তঃকরণসহ সংসারের স্বতন্ত্র সত্তা একেবারেই অবিদ্যমান হয়ে যায় এবং পরমাত্ম সত্তার ভাব সদাসর্বদা জাগ্রত থাকে। অন্তঃকরণের সঙ্গে নিজের কোনো সম্বন্ধ না থাকায় তার অন্তঃকরণ যেন ভস্মীভূত হয়ে যায়। যেমন হ্যাচাকের ভস্মীভূত ম্যান্টলের বিশেষ দীপ্তি থাকে সেই রকম ওই ভস্মীভূত অন্তঃকরণের মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

যেমন, পরমাত্মার সত্তা-স্ফূর্তির দ্বারা সমগ্র সংসারের কাজকর্ম চলতে থাকলেও পরমাত্মতত্ত্বে (ব্রহ্মে) বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেয় না, সেই রকম তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের স্বভাব[১], জিজ্ঞাসুর জানার অভিলাষ[২] এবং ভগবৎ প্রেরণা[৩]—এইগুলির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের শরীরের মাধ্যমে সুচারুরূপে আচরিত হতে থাকলেও তাঁর স্বরূপে বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেয় না। তাঁর মধ্যে নির্লিপ্ততা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে বিরাজ করে।[৪] যতক্ষণ পর্যন্ত ভাগ্যের জোর থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর

---

[১] সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ (গীতা ৩।৩৩)

[২] তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যান্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীতা ৪।৩৪)

[৩] অহং-এর বিনাশ হওয়ার পর ভগবানের সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের ঐক্য হয়ে যায়—'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' (গীতা ১৪।২), অতএব তাঁর দ্বারা সম্পন্ন সকল ক্রিয়া ভগবৎ-প্রেরিত হয়ে থাকে।

[৪] অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎপরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ (গীতা ৩।৩১)
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টিং সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ (গীতা ১৪।২৪)
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ (গীতা ১৪।২৩)

অন্তঃকরণ ও বহিস্থ থেকে আদর্শ আচরণ হতে থাকে।

উপসংহার

উপরোক্ত বিবেচনার দ্বারা এইটিই প্রমাণিত হয় যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ সংসারের অতীত এবং প্রাকৃত দৃষ্টির অগোচর যে সর্বত্র পরিপূর্ণ ভগবত্তত্ত্ব অথবা পরমাত্মতত্ত্ব রয়েছে সেটিই হল সকল দর্শনের আধার এবং সকল সাধনার অন্তিম লক্ষ্য। তাকে উপলব্ধি করে কৃত-কৃত্য, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হওয়ার জন্যই মনুষ্য-শরীর লব্ধ হয়েছে। মানুষ ইচ্ছা করলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগ—যেকোনো একটি যোগমার্গ অনুসরণ করে সেই তত্ত্বকে সহজে লাভ করতে পারে। তার উচিত হল ইন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে বিবেক-বিচারকেই গুরুত্ব দেওয়া এবং 'অ-সৎ'-এর দ্বারা স্বীকৃত সম্বন্ধের মধ্যে যে সদ্ভাব তাকে পরিত্যাগ করে 'সৎ'-কে উপলব্ধি করা।

সত্তা দু রকমের হয়ে থাকে—পারমার্থিক এবং সাংসারিক। পারমার্থিক সত্তা তো স্বতঃসিদ্ধ (অবিকারী), কিন্তু সাংসারিক সত্তা সৃষ্ট হয়ে থাকে (বিকারী)। সাধকের যে ভুলটি হয় তা হল এই যে তিনি বিকারী সত্তাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেন। তাতে সংসার তাঁর কাছে সত্য বলে মনে হয় অর্থাৎ তিনি সংসারকে সত্য বলে মনে করতে শুরু করেন।[১] এইজন্য তিনি রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে যান।

---

[১] অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥ (বাক্যসুধা ২০)

'অস্তি, ভাতি, প্রিয়, রূপ তথা নাম—এই পাঁচটির মধ্যে প্রথম তিনটি ব্রহ্মের রূপ এবং শেষের দুটি জগতের।'—এই শ্লোকের 'অস্তি' পদ পরমেশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ (অবিকারী)। স্বরূপের বাচক এবং

তাই সাধকের উচিত তিনি যেন বিবেকদৃষ্টিকে গুরুত্ব দিয়ে পারমার্থিক সত্তার সত্যতা এবং সাংসারিক সত্তার অসত্যতাকে আলাদা করে চিনে নেন। তাতে তাঁর রাগ-দ্বেষ অনেক কমে যায়। বিবেকদৃষ্টির পূর্ণতা হলে সাধক তত্ত্বদৃষ্টি লাভ করেন। তার ফলে তাঁর মধ্যে রাগ-দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায় এবং সেই ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি হয়।

ভগবতত্ত্ব সমস্ত দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে পরিপূর্ণ। অতএব তার প্রাপ্তি কোনো ক্রিয়া, শক্তি, যোগ্যতা, অধিকার, পরিস্থিতি, সামর্থ্য, বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় প্রভৃতির উপর আশ্রিত নয়। কেননা চেতন (সত্য)-এর প্রাপ্তি জড়তা (অসত্য)-র দ্বারা হয় না বরং জড়তাকে ত্যাগ করলেই হয়।

মানুষ যদি তার নিজের অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করে তাহলে তত্ত্বপ্রাপ্তি সহজেই হয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে জাগৃতি, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা এবং সমাধি অবস্থা পরিবর্তনশীল এবং বহু প্রকারের হয়। কিন্তু এই অবস্থাগুলিকে যিনি জানেন তিনি এক এবং অপরিবর্তনীয়ই থাকেন। যিনি অবস্থাগুলি জানেন তিনি যদি তার অতীত না হতেন তাহলে অবস্থাগুলির পার্থক্য, সেগুলির সংখ্যা, সেগুলির পরিবর্তন (আসা-যাওয়া), সেগুলির সন্ধি এবং সেগুলির অবিদ্যমানতা বিষয়গুলির জ্ঞাতা কে হত ? এই অবস্থাগুলি 'অহং'

'জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্ধতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতি।' (নিরুক্ত ১।১।২)

'উৎপন্ন হওয়া, অস্তিত্ব (হওয়া-ভাব), সত্তাবান হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া, বৃদ্ধি হওয়া, ক্ষীণ হওয়া এবং বিনষ্ট হওয়া—এই ছয়টিকে বিকার বলা হয়েছে।'

এখানে 'অস্তি' পদ সংসারের বিকারের বাচক। তাৎপর্য হল এই যে এই বিকাররূপ অস্তির মধ্যে নিরন্তর পরিবর্তন হচ্ছে। এটি এক মুহূর্তের জন্যও একই রূপে থাকে না।

(জড়ের দ্বারা স্বীকৃত সম্বন্ধ)-এর উপর টিকে আছে আর 'অহং' সত্য তত্ত্বের উপর টিকে আছে। তাৎপর্য হল একমাত্র সত্যতত্ত্ব ছাড়া অন্য কোনো অবস্থাদি কিংবা মেনে নেওয়া 'অহং'-এর স্বতন্ত্র সত্তা নেই। এই রকম অবস্থাগুলি থেকে এবং 'অহং' থেকে নিজস্বতা (স্বরূপ)-কে আলাদা বলে উপলব্ধি করলে তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়ে গেলে 'অহং' এবং 'অহং'-এর অবস্থাগুলির স্বতন্ত্র সত্তা সত্যরূপে একেবারেই থাকে না। সমুদ্র এবং তরঙ্গের মধ্যে যেমন জলেরই সত্তা থাকে, সমুদ্র এবং তরঙ্গের কোনো কালে কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই, সেই রকম 'অহং' এবং অবস্থাগুলির মধ্যে একমাত্র ভগবত্তত্ত্বই আছে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত এক ভগবত্তত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে। একেই গীতা '**বাসুদেবঃ সর্বম্**' বলেছে।

সৎ-অসতের বিবেক

শ্রোতা—সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই—এই কথা বুদ্ধি দিয়ে তো বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এর পরের স্থিতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারছি না।

স্বামীজী—কোনো চিন্তা নেই। বুদ্ধি পর্যন্ত যদি বুঝেছেন তবুও ভালো। আপনারা এটুকু মেনে নিন যে বাস্তবে কথাটা তাই। আপনাদের বাল্যাবস্থা কি এখনও আছে ? নেই, তার মানে বাল্যাবস্থার বিচ্ছেদ হয়েছে, তাই না ? বাল্যাবস্থার বিচ্ছেদ যখন হয়েছে তখন এখন যে অবস্থা রয়েছে তার বিচ্ছেদ কি হবে না ? যে কোনো অবস্থাই আসুক, যে কোনো পরিস্থিতিই আসুক তার বিচ্ছেদ হবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সব কিছুর বিচ্ছেদ হলেও পরমাত্মার বিচ্ছেদ হবে না। কেননা পরমাত্মা সবেতেই পরিপূর্ণ এবং সকলের অতীত। যেমন, এই আকাশ কোথায় নেই ? আমরা যেখানে বসে আছি সেখানেও আকাশ রয়েছে, আমরা যেখানে নেই সেখানেও আকাশ রয়েছে। সেই রকম, আমরা যেখানে আছি সেখানে পরমাত্মা আছেন এবং আমরা যেখানে নেই সেখানেও পরমাত্মা আছেন। পরমাত্মা সকলের ভিতরে, বাইরে, উপরে, নীচে সর্বত্র পরিপূর্ণ আছেন এবং তিনি সকলের অতীতও।

এই সব শরীর আগে ছিল না, পরে থাকবে না এবং এখনও নিরন্তর নাস্তির দিকে যাচ্ছে। যেমন বাল্যাবস্থা নেই তেমনই এটিও থাকবে না। কিন্তু পরমাত্মা থাকবেন। বাল্যাবস্থা নেই বলে কি আপনারা নেই ? অতএব পরমাত্মা আছেন, সংসার নেই। পরমাত্মা আছেন এটি মেনে নিলে যোগ হয়ে গেল, সংসার নেই এটি মেনে নিলেও যোগ হয়ে গেল। সমতার নাম যোগ—**'সমত্বং যোগ উচ্চতে'** (গীতা ২।৪৮) এবং দুঃখরূপ সংসারের বিয়োগের নামও যোগ—**'তং**

বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসঞ্জিতম্' (গীতা ৬।২৩)। সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে সমতাই থাকবে কেননা সংসার হল বিষম এবং পরমাত্মা সম—**'সমং সর্বেষু ভূতেষু'** (গীতা ১৩।২৭)। ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আকাশ ভিন্ন ভিন্ন নয়, তা এক। সেইরকম পরমাত্মাও এক। তিনি সকলের মধ্যে আছেন এবং সকলের অতীতও। সংযোগেও তিনি আছেন, বিয়োগেও তিনি আছেন। তিনি আগেও ছিলেন, পরেও থাকবেন এবং এখনও আছেন।

সংসার নেই এবং পরমাত্মা আছেন—এই কথাটি আপনারা মেনে নিন। এই যে সংসারকে দেখা যাচ্ছে এ আগে ছিল না, পরে থাকবে না এবং এখনও নাস্তির দিকে যাচ্ছে। পরমাত্মা আগে ছিলেন, পরে থাকবেন এবং এখনও আছেন। সংসার নেই—এই কথা বলুন, অথবা পরমাত্মা আছেন, এই কথা বলুন—একই কথা। এতে কোনো অসুবিধা আছে কি ?

শ্রোতা—যা নেই তার জন্য তো পাপ করি। তার মানে কথাগুলি কেবল শেখা হল।

স্বামীজী—যা আছে তাকে প্রধান বলে মেনে নিন। যাচাই করে তাকে হাল্কা করবেন না, প্রত্যুত নিজের আগ্রহকে তত গুরুত্ব দেবেন না। ভুলকে গুরুত্ব না দিয়ে যা সত্য তাকে গুরুত্ব দিন। পাপ চিরকাল থাকে না। যা চিরকাল থাকে না তার উপর জোর করবেন না। বরং যা চিরকাল থাকে তার উপর জোর দিন। আপনারা নিজেরাই অনুভব করুন কোন্ জিনিস চিরকাল থাকে ? পাপ চিরকাল থাকে, নাকি নিজস্বতা (স্বরূপ) চিরকাল থাকে ? যা চিরকাল থাকে তাতে যদি দৃঢ় থাকেন তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

পাপ হয়ে যায়, অন্যায় হয়ে যায়, ছল-কপটতা হয়ে যায়। তাতে কি 'অস্তি' অবিদ্যমান হয়ে যায় ? আপনারা 'অস্তি'র দিকে দেখুন। 'অস্তি'-তে কি কোনো পার্থক্য হয় ? আপনারা যখন 'নাস্তি'-কে 'অস্তি' বলে মেনে নেন তখনই গোলমাল হয়। 'নাস্তি'-কে নাস্তি বলে

মানুন এবং 'অস্তি'-কে 'অস্তি' বলে। কোনো পাপ করে ফেললে মধ্যখানে ভুল হয়ে গেল ! ভুলের আধারে 'অস্তি'-কে কেন নিষেধ করেন ?

শ্রোতা—'অস্তি'-কে মেনে নিলাম। কিন্তু অনুভব না হলে এই মানা স্থায়ী হয় না।

স্বামীজী—দেখুন ভাই, এটি চোখ দিয়ে দেখা যায় না। দেখার দুটি পদ্ধতি আছে—এক, চোখ দিয়ে দেখা এবং দুই, অন্তরে মান্যতার দ্বারা। অন্তরে অনুভূতি হয়, বুদ্ধির দ্বারা স্বীকৃতি হয়—একেও দেখা বলে। এই 'অস্তি' কখনোই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। এটি স্বীকৃতির দ্বারা হয়। আপনাদের নাম, জাতি, গ্রাম, মহল্লা, ঘর কি এখন দেখা যাচ্ছে ? দেখা যাচ্ছে না বলে তা কি নেই ? যা দেখা যায় না তা নেই এমন কথা নয়। যা দেখা যায় না তাই থাকে। পরমাত্মাকে দেখা না গেলেও তিনি আছেন। নাম, জাতি প্রভৃতির স্বপক্ষে কোনো শাস্ত্রীয় প্রমাণ নেই। তা কেবল আপনাদের কল্পনা। কিন্তু পরমাত্মার অস্তিত্বের স্বপক্ষে শাস্ত্র, বেদ, সাধু-মহাত্মারা প্রমাণ এবং তাঁকে মানার ফলও বিলক্ষণ (কল্যাণ)। এইজন্য পরমাত্মাকে দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিন।

ত্রুটি অর্থাৎ ভুল ধারণা—এটি উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়। কিন্তু পরমাত্মা উৎপন্নও হন না, বিনষ্টও হন না। উৎপন্নশীল বস্তুর দ্বারা উৎপন্নশীল নয় এমন বস্তুর নিরাকরণ কেন করেন ? আমরা মিথ্যাচার করলাম তাতে কি পরমাত্মার অস্তিত্ব দূর হয়ে যাবে ? পরমাত্মার অস্তিত্বে বাধা কোথায় ? এইটি মনে করুন যে যদি পাপ হয়ে থাকে তবে তা ভুলক্রমে হয়েছে, কিন্তু পরমাত্মা যে আছেন তা ভুল নয়। পরমাত্মাকে যত দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেবেন ভুল ততই দূর হয়ে যাবে। যখন আপনারা ভুল করেন তখন 'পরমাত্মা আছেন' এই কথাটি আপনাদের মনে থাকে না। এটি মনে না থাকার জন্যই ভুল হয়। যা 'অস্তি' তার প্রতি বিমুখ হন, তাকে ভুলে যান, তখনই এই ভুল হয়ে যায়। এইজন্য আপনাদের তাঁর প্রতি বিমুখ হতে নেই। কখনো হঠাৎ যদি ভুল হয়ে যায়

তবে তাকে গুরুত্ব দেবেন না। যা সত্যকার জিনিস তার প্রতি গুরুত্ব দিন। ভুল দূর হয়ে যায়, কিন্তু পরমাত্মা থাকেন, তিনি দূর হন না। যা প্রতি মুহূর্তে থাকে তাঁকে মানুন। এখন বলুন তো বাধা কোথায় ?

শ্রোতা—অনেক বছর ধরে এই কথা শুনে আসছি। তবু কেমন যেন নিজেকে রিক্ত বলে মনে হয়।

স্বামীজী—এই রিক্ত ভাবের জ্ঞান আছে, কি নেই ? শূন্যতাবোধের জ্ঞানও কি শূন্য ? আপনারা জ্ঞানকে নিরাদর করেন আর শূন্যতাকে করেন সম্মান। জ্ঞান তো ভরাট, তাতে শূন্যতা নেই-ই। শূন্যতা (নাস্তি)-কে যে জানে সে ভরাট (অস্তি)-ই হয়, শূন্য কী করে হবে ? বাস্তবে শূন্যতা নেই। অ-সৎকে সত্তা মেনে নিলেই শূন্যতা মনে হয়। কেননা অ-সতের সত্তা নেই। তাৎপর্য হল আপনারা অ-সৎকে সত্তা যুক্ত মেনে নিয়েছেন আর অ-সৎকে যখন লাভ করেন না তখন শূন্যতা বোধ করেন। দ্বিতীয়ত, আপনারা শূন্যতার সত্তা মেনেছেন, কিন্তু সত্তা কি শূন্য হয় ? সত্তাও শূন্য হয় না, জ্ঞানও শূন্য হয় না। সত্তা (সৎ) এবং জ্ঞান (চিৎ)—দুটিই পরমাত্মার স্বরূপ। তাহলে পরমাত্মা আছেন, একথা মানতে বাধা কোথায় ? একে আপনারা বাজে কথা মনে করবেন না। এই দিকে আপনারা খেয়াল করেন না সেইটিই হল বাধা। এর অবিদ্যমানতা হয়ই না। এই দিকে দৃষ্টি দেবেন, কেবল এইটুকুই আপনাদের করতে হবে।

পরমাত্মা যেমনকার তেমনই আছেন। তাঁকে তৈরি করতে হয় না, উৎপন্ন করতে হয় না। কেবল সেদিকে দৃষ্টি দিতে হয়। আমাদের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্ক, নিত্য যোগ। সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদের অনুভূতি হয়ে গেলে পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যযোগের অনুভূতি হয়ে যাবে। পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যযোগকে যদি মানেন তবে 'যোগ' হয়ে যাবে এবং সংসারের সঙ্গে নিত্য বিয়োগ যদি মানেন তাহলেও 'যোগ' হয়ে যাবে। কথা একটিই। আপনারা এর উপর গুরুত্ব দেন না। যা যাওয়া-আসা করে সেই ধনদৌলতের উপরেই আপনারা গুরুত্ব দেন, আর যা থাকে

তাকে গুরুত্ব দেন না। যা আসে যায় তাকে অস্বীকার করুন এবং যা থাকে তাকে স্বীকার করুন। অস্বীকার করার নামও 'যোগ' এবং স্বীকার করার নামও 'যোগ'।

যার আদি নেই, অন্ত নেই তার মধ্যও নেই—এইটিই সিদ্ধান্ত। যেমন, স্বপ্ন দেখলেন, কিন্তু স্বপ্ন দেখার আগে তা ছিল না, পরেও তা থাকবে না। ফলে স্বপ্নের সময়েও 'নাস্তি'-ই প্রধান ছিল। স্বপ্ন প্রধান ছিল না। এইজন্য 'নাস্তি' থাকে। এইভাবে সংসার আগে ছিল না, পরে থাকবে না এবং বর্তমানে তা নিরন্তর 'নাস্তি'র দিকে যাচ্ছে। অতএব এতে 'নাস্তি'-ই প্রধান। এতে বাধা কোথায় ?

শ্রোতা—'নাস্তি'র প্রতি মমতা-আসক্তি দূর হয় না ?

স্বামীজী—মমতা-আসক্তি থাক, না-থাক পরমাত্মা তো থাকবেন। মমতা, আসক্তি, কামনা প্রভৃতি আসা যাওয়া করে এবং তত্ত্ব নিত্য। যা থাকে তার দিকে দৃষ্টি দিন। যা আসে এবং শেষ হয়ে যায় সেদিকে দৃষ্টি দেবেন না, তাকে গুরুত্ব দেবেন না। যা আসে, যায়, সৃষ্ট হয়, ধ্বংস হয়, যা রূপান্তর হয়, বিনষ্ট হয় তার গুরুত্ব কী ? পরমাত্মা সৃষ্ট হন না, বিনষ্ট হন না, তৈরি হন না, পরিবর্তিত হন না, উৎপন্ন হন না এইজন্য তিনি হলেন অস্তি। আসক্তি যদি হয়ে যায় তো হতে দিন, কামনা যদি হয়ে যায় তো হতে দিন, তার পরোয়া করবেন না। 'অস্তি'কে দৃঢ় করুন। আসক্তি হয়ে গেলে তাতেও তিনি আছেন। কামনা হয়ে গেলে তাতেও তিনি আছেন, যা কিছুই হোক না কেন তিনি যেমনকার তেমনই থাকেন। যদি সেই 'অস্তি'-র দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় তাহলে এইসব মমতা, আসক্তি, কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি সব দূর হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। 'অস্তি'-কে মেনে নিলে 'নাস্তি' থাকবে কী করে ? যার নামই হল 'নাস্তি' তা কী করে থাকবে ? এতে বাধা হল এই যে আপনারা এই কথাটিকে শ্রদ্ধা করেন না, গুরুত্ব দেন না। এখন যদি আপনারা দশটা টাকা পান তাহলে তাতে গুরুত্ব দেবেন, কিন্তু যিনি সদা-সর্বদা থাকেন তাকে গুরুত্ব দেন না—এটি খুবই আশ্চর্যের কথা !

বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র 'অস্তি'-কে গুরুত্ব দিয়েছে। সাধু-মহাত্মারাও একে গুরুত্ব দিয়েছেন। সেইজন্যই তো সংসারের ভালো-মন্দের কোনো প্রভাব তাঁদের উপর পড়ে না। যা সর্বদা থাকে সেই 'অস্তি'-তে কী প্রভেদ হবে। দুঃখ, সন্তাপ কী করে হবে ?

হৈ সো সুন্দর হৈ সদা, নহিঁ সো সুন্দর নাহিঁ।
নহিঁ সো পরগট দেখিয়ে, হৈ সো দীখে নাহিঁ॥

যা থাকে তাকে চোখে দেখা যায় না। যা চোখে দেখা যায় তা থাকে না। বলা হয়, যাকে চোখে দেখা যায় না তাকে কী করে মানব ? এটি বুদ্ধিমানের প্রশ্ন নয়। বুদ্ধিমানের তো এই প্রশ্ন করা উচিত যে যাকে চোখে দেখা যায় তাকে মানি কী করে ? কেননা যা দৃশ্যমান তা তো বিনষ্ট হয়, খারাপ হয়, পরিবর্তিত হয়, এটি তো প্রত্যক্ষ। যা স্থির থাকে না, বদলে যায় তাকে কী করে মানা যেতে পারে ? নদীতে জল প্রবাহিত হয় তেমনই সমগ্র সংসার প্রবাহিত হচ্ছে, মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে। অবিদ্যমানতার দিকে যাচ্ছে। একে আমরা 'অস্তি' বলে কী করে মানব ? খুবই সহজ সরল কথা। এতে কোনো কঠিনতা নেই। কঠিনতা এইটিই যে একে আপনারা গুরুত্ব দেন না। এর মূল্য আপনাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

যেসব মানুষ সংসারকে গুরুত্ব দেয় না, ধনসম্পত্তিকে গুরুত্ব দেয় না তাঁরা কি বেঁচে থাকে না ? আপনারা গুরুত্ব না দিলে মরে যাবেন নাকি ? যিনি গুরুত্ব দেন না তাঁর কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে বলেই তো তিনি এই সমস্ত সাংসারিক বস্তু প্রভৃতিতে গুরুত্ব দেন না। তাঁর মনে এই সংশয়, শঙ্কা জাগে না যে, এছাড়া কাজ কী করে চলবে। যেমন ছোটবেলায় আপনারা খেলনাকে গুরুত্ব দিতেন, কিন্তু এখন তা দেন না। কেননা এখন আপনারা গুরুত্ব দেন টাকা-পয়সায়। টাকা-পয়সা প্রভৃতিকে গুরুত্ব না দিয়ে সৎ-তত্ত্ব (অস্তি)এর উপর গুরুত্ব দিন, তাহলে অ-সতের সত্তার স্বতই নিরাকরণ হয়ে যাবে।

সকলের মধ্যে পরমাত্মার দর্শন

স্নান করার সময় আপনারা যখন সাবান লাগিয়ে ঘষতে থাকেন তখন আপনাদের কেমন দেখায় ? খারাপ দেখায়। খারাপ দেখালেও একথা মনে হয় না যে আপনাদের রূপ কুরূপ। এই কথাই মনে হয় যে সাবানের জন্যই বাইরে থেকে এরকম দেখাচ্ছে, আসলে রূপ এরকম নয়। তেমনি যদি প্রচণ্ড খারাপ লোককে দেখা যায় তাহলে মনে করতে হবে যে এটি তার বাহ্যিক রূপ, অন্তরে তার পরমাত্মার অংশ রয়েছে। কালো বস্ত্র পরিধান করলে কি মানুষ কালো হয়ে যায় ? তার রূপ যেমন সে তেমনিই থাকে। তেমনই দুষ্টতা এবং সজ্জনতা অন্তকরণে থাকে। যে অংশ পরমাত্মার তাতে তফাৎ হয় না। একজন জীবন্মুক্ত, ভগবৎ প্রেমী, সিদ্ধ মহাপুরুষ এবং আর একজন দুষ্ট, কসাই, জীবহত্যাকারী, চুরি করে, ডাকাতি করে—তাহলেও দুজনের মধ্যে পরমাত্মতত্ত্ব একই। এই তত্ত্বে কোনো পার্থক্য নেই। যে পরমাত্মতত্ত্বকে চায় সে ওই তত্ত্বের দিকেই দৃষ্টিপাত করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যথাযথ আচরণ করতে থাকলেও সাধকের দৃষ্টি ওই তত্ত্বের দিকেই থাকা উচিত। সেই তত্ত্বের দিকে যিনি দৃষ্টি রাখেন তাঁরই নাম 'সমদর্শী'। যিনি আচরণে সমতা রক্ষা করেন, সকলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন, বিবাহাদি করেন তিনি হলেন 'সমবর্তী', তিনি সমদর্শী নন। 'সমবর্তী' হল যমরাজের নাম—**'সমবর্তী পরেতরাট্'** (অমরকোষ ১।১।৫৮), কেননা মৃত্যু সকলের কাছেই সমান। অতএব জ্ঞানীর নাম হল—সমদর্শী এবং যমরাজের নাম হল.... সমবর্তী। জ্ঞানী সমদর্শী কেন ? কেননা তিনি সকলের মধ্যে সমরূপ পরমাত্মাকে দেখেন। মন্দ লোককে দেখে যদি মন্দ-ভাব জেগে ওঠে তাহলে সমদর্শী নয়, পরমাত্মার জিজ্ঞাসু নয়, অন্তত সেই সময়ে তো কিছুতেই নয়।

একটি স্থূল দৃষ্টান্ত আছে। একজন বৈরাগী ছিলেন। তাঁর কাছে সোনার তৈরি একটি গণেশের ও একটি ইঁদুরের মূর্তি ছিল। বৈরাগী তীর্থে যাবেন। তিনি মূর্তি দুটিকে স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন যে মূর্তি দুটি নিয়ে তার দাম দিতে। তাহলে তিনি তীর্থে যেতে পারবেন। দুটি মূর্তিরই ওজন এক ছিল। সেজন্য স্বর্ণকার মূর্তি দুটির জন্য সমান দাম দিল। বৈরাগী রেগে গেলেন—গণেশের যা দাম, ইঁদুরেরও তাই দাম, এ কখনো হতে পারে ? ইঁদুর তো বাহন আর গণেশ তার উপর বসে থাকেন, তার মালিক। স্বর্ণকার বলল—বাবাজী, আমি গণেশ এবং ইঁদুরের দাম দেখি না, আমি তো সোনার দাম ধরি। তেমনই যিনি পরমাত্মতত্ত্ব চান তিনি প্রাণীদের দেখেন না, তাদের মধ্যে যে পরমাত্মতত্ত্ব আছে তিনি তার দিকেই লক্ষ্য রাখেন।

পরমাত্মা সকলের মধ্যেই আছেন, এটি খুবই উচ্চ শ্রেণীর কথা। এতটা যদি বুঝতে না পারেন তাহলে অন্তত এটুকু বুঝে নিন যে 'সবই পরমাত্মার'। এটি সহজেই বোঝা যাবে যে যত প্রাণী আছে সবই পরমাত্মার। যদি পরমাত্মারই হয় তাহলে এমন হলেন কী করে ? বেশি আদর দিলে ছেলে বিগড়ে যায়। এরা হল পরমাত্মার আদরের ছেলে। সেইজন্য বিগড়ে গিয়েছে। তাহলেও তারা পরমাত্মারই। অতএব তাদের পরমাত্মার মনে করে তাদের সঙ্গে যথোচিত আচরণ করবেন। যেমন, যদি আমাদের কোনো খুবই প্রিয় ভাইয়ের প্লেগ হয় তাহলে প্লেগকে অস্পৃশ্য জেনেও ভাইয়ের সেবা আমরা করি, যার সেবা করি সে প্রিয়, কিন্তু রোগ অপ্রিয়। তাই খাওয়া-দাওয়াতে ছোঁয়াছুঁয়ি এড়িয়ে চলি। তেমনই কারো যদি স্বভাব বিগড়ে যায় তাহলে মনে করতে হবে যে সে ব্যাধিগ্রস্ত। তার মধ্যে বিকৃতি এসেছে। তার সঙ্গে আচরণে যে তফাৎ দেখা যায় তা বাহ্যিক। অন্তরে তার প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই।

ভগবান সকলের সুহৃদ—**'সুহৃদঃ সর্বভূতানাম্।'** (গীতা ৫।২৯)।

সাধুদের সম্পর্কেও এই কথা তাঁরা সকল প্রাণীর সুহৃদ—**'সুহৃদং সর্বদেহিনাম্'** (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২৯)। সুহৃদ হওয়ার মানে কী ? তার মানে হল, অন্যে কী করে, কেমনভাবে করে, আমাদের কথা শোনে, কি শোনে না, আমাদের অনুকূল, না প্রতিকূল, এই সব বিচার না করে আমাদের দিক থেকে তার ভালো কী করে হবে সেই মনোভাব রাখা চাই। তার সেবা হবে কী করে ? ঠিক কথা যে, সেবা করার প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন, চোর-ডাকাতকে মারধোর করাও তার সেবা। তাৎপর্য হল, তার যেন পরিবর্তন হয়, তার মঙ্গল হয়, তার উদ্ধার হয়। শিশুরা যখন আপনাদের কথা শোনে না তখন তাদের কি আপনারা থাপ্পড় মারেন না ? তখন কি তাদের প্রতি আপনাদের শত্রুতা থাকে ? বাস্তবে, তাদের প্রতি আপনাদের বেশি স্নেহ থাকে বলেই তাদের আপনারা থাপ্পড় মারেন। ভগবানও তাই করে থাকেন। যেমন, শিশুরা খেলা করছে, কারো চিত্ত প্রসন্ন হয়ে গেল তখন তিনি স্নেহবশে তাদের মিষ্টি বিতরণ করলেন। কিন্তু তারা যদি অসভ্যতা করে তখন তিনি সবাইকে থাপ্পড় মারেন না, তিনি কেবল নিজের ছেলেটিকেই থাপ্পড় মারেন। এই রকম ভগবানের বিধান যদি আমাদের প্রতিকূল হয় তবে তা হল তাঁর অধিক স্নেহের, বেশি করে আপন করে নেবার মতন।

অন্যের প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে যথোচিত নিজের ক্ষমতানুসারে আচরণ করা উচিত। কিন্তু তার দোষ দেখা উচিত নয়। কারো দোষ দেখার অধিকার আমাদের নেই। যেমন, অভিনয়ে একজন মেঘনাদ হলেন এবং আর একজন হলেন লক্ষ্মণ। দুজনেই এক দলের লোক। কিন্তু অভিনয়ের সময় বলেন—'ওরে আমি তোকে হত্যা করব, আমার সামনে আয়, আমি তোকে শেষ করে দেব।' তারা অস্ত্র চালনাও করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কি শত্রুতা আছে ? অভিনয়ের পরে তারা এক

সঙ্গে থাকে, খাওয়া-দাওয়া করে কেন ? তাদের অন্তরে শত্রুতা নেই।

সাধুদের জন্য বলা হয়েছে—

সন্তোঁ কী গতি রামদাস, জগ সে লকী ন জায়।
বাহর তো সংসার-সা, ভীতর উল্টা থায়॥

বাইরে তারা সাংসারিক আচরণ করে কিন্তু অন্তরে তারা পরমাত্মাকে দেখে। অন্তরে তাদের কারো প্রতি বিদ্বেষ থাকে না, বরং সকলের প্রতি মৈত্রী ও করুণার ভাব থাকে—**'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'** (গীতা ১২।১৩)। মন থেকে তারা সকলের কল্যাণ চায়।

এখন প্রশ্ন হল আমাদের দৃষ্টি সম হবে কী করে ? প্রথমত আপনাদের মনে এই কথাটি যেন দৃঢ়বদ্ধ থাকে যে 'আমরা সাধক, পরমাত্মার জিজ্ঞাসু' এবং দ্বিতীয়ত এই কথাটিও যেন দৃঢ় থাকে যে, 'সকলের মধ্যে পরমাত্মা আছেন।' সকলের মধ্যে পরমাত্মা কী করে দেখবেন ? এই কথাটি একটু মন দিয়ে শুনুন। 'মানুষ বিদ্যমান'—এই যে বিদ্যমানতা, সত্তা এ কখনো দূর হয় না। সে খারাপ হোক কিংবা ভালো, দুরাচারী হোক কিংবা সদাচারী, তার মধ্যে যে বিদ্যমানতা রয়েছে তা কি দূর হবে ? সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসে বিদ্যমানতা আছে আবার ময়লা-আবর্জনার মধ্যেও বিদ্যমানতা আছে। এই সব জিনিসের রূপ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু বিদ্যমানতা (সত্তা) বদলায় না। ময়লা আবর্জনা জ্বালিয়ে দিলে ছাই হয়ে যাবে। তার রূপ অন্য রকম হয়ে যাবে। কিন্তু তার সত্তা ভিন্ন হবে না। সেই সত্তা পরমাত্মার। সেই সত্তার দিকেই দৃষ্টি রাখুন। পরিবর্তন যা হয় তা প্রকৃতিতে। সংক্ষেপে যদি আপনাদের প্রকৃতির কথা বলি তবে তা হল বস্তু এবং ক্রিয়া। এই দুটি হল প্রবৃত্তি। বস্তুর পরিবর্তন হয় এবং ক্রিয়ারও পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন হল প্রকৃতির। আপনারা প্রকৃতির জিজ্ঞাসু নন, আপনারা হলেন পরমাত্মার জিজ্ঞাসু। সুতরাং পরিবর্তনশীলকে না দেখে যা থাকে সেই

বিদ্যমানতাকে দেখুন। রয়েছে সংসার, মানুষ, পশু, পাখি, এটি জীবিত, এটি মৃত—এতে তো তফাৎ আছে, কিন্তু বিদ্যমানতাতে প্রভেদ কোথায় ? লাভ হল, লোকসান হল, নাতির জন্ম হল, ছেলে মারা গেল—এই লাভ-লোকসান, জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ রয়েছে, কিন্তু এদের জ্ঞানেতে প্রভেদ কোথায় ? ওই বস্তুর সত্তাতে (বিদ্যমানতায়) কোনো পার্থক্য নেই, আপনাদের জ্ঞানেতেও নেই।

যে যেমন জায়গায় আছে, তার আচরণ তো সেই অনুসারেই হবে। আমরা যখন সাধু তখন সাধুর মতোই আচরণ করব। যদি গৃহস্থ হই তবে গৃহস্থের মতো আচরণ করব। সম্মুখস্ত ব্যক্তি, পরিস্থিতি যেমন সেই অনুযায়ী আচরণ করব। কিন্তু অন্তরে, সিদ্ধান্তে যেন এই ভাব থাকে যে সকলের মধ্যে এক পরমাত্মতত্ত্বের সত্তা বিদ্যমান। সকলের মধ্যে সত্যরূপে, জ্ঞানরূপে এবং আনন্দরূপে পরমাত্মা পরিপূর্ণ হয়ে আছেন।

একটি হল কাল্পনিক সত্তা এবং একটি বাস্তবিক। জন্মের পর যে সত্তা তা কাল্পনিক আর যা জন্মায় না অর্থাৎ যা নিত্য স্থিতিশীল সত্তা তা হল বাস্তবিক। যেমন, শিশু জন্মগ্রহণ করল আর জন্মাবার পর তাকে 'শিশু' বলে মনে হল। জন্মাবার আগে সে শিশু ছিল না এবং বাল্যাবস্থার পর সে যুবক হয়ে যাবে। এইভাবে পরিবর্তনশীল কাল্পনিক সত্তা হল প্রকৃতির। মূলে পরমাত্মতত্ত্বের বাস্তবিক সত্তা আছে, এর কখনো পরিবর্তন হয় না। পরমাত্মতত্ত্বে যিনি জিজ্ঞাসু তিনি ওই পরিবর্তনশীল সত্তাকে দেখেন না আর সংসারী মানুষ পরিবর্তনশীল সত্তাকে দেখে। একজনের দৃষ্টি পারমার্থিক আর অন্য জনের দৃষ্টি সাংসারিক। যেমন স্থূল দৃষ্টিতে মা, বোন এবং স্ত্রী-কে শারীরিক গঠন অনুসারে একই রকম মনে হয়। কিন্তু ভাবদৃষ্টিতে মা, বোন এবং স্ত্রী-কে ভিন্ন ভিন্ন বলেই বোঝা যায়। বাহ্যিক স্থূল দৃষ্টি পশুর, তা মানুষের দৃষ্টি

নয়। সাধকের দৃষ্টি তত্ত্বে নিবদ্ধ। তাই তিনি সর্বত্র পরমাত্মাকেই দেখেন—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

(গীতা ৬।৩০)

'যে আমাকে সকলের মধ্যে দেখে এবং সকলকে আমার মধ্যে দেখে তার কাছে আমি অদৃশ্য নই এবং সেও আমার কাছে অদৃশ্য নয়।'

একটি ছেলে মা-কে বলল 'মা, আমার গুড় চাই।' মা বললেন, গুয়ার (এক জাতীয় পশুর খাদ্য) নিয়ে যা আর মুদিকে বল তার বদলে গুড় দিতে। মুদি ওজন করে গুয়ার নিল এবং ওজন করে গুড় দিল। ছেলেটি ভাবতে লাগল, মুদি কতই না বোকা ! গুয়ার হল পশুর খাদ্য, তা মানুষের কোনো কাজে আসে না। মুদি তার বদলে আমাকে গুড় দিল। এইভাবে গুয়ার এবং গুড়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার ফলে ছেলেটি মুদিকে বোকা মনে করল। কিন্তু মুদির দৃষ্টি ছিল দামের দিকে। গুয়ার কত পয়সার আর গুড় কত পয়সার ! মুদি দুভাবে পয়সা কামায়। প্রথমত, মাল কেনে সস্তায় এবং দ্বিতীয়ত, মাল বেচে বেশি দামে। সুতরাং সে গুয়ার থেকেও লাভ করল আবার গুড় বেচেও লাভ করল। মুদির কাছে গুয়ার এবং গুড়ের কোন্ প্রয়োজন ! তাকে তো পয়সা কামাতে হবে। সাধকের দৃষ্টিও এইভাবে পরমাত্মতত্ত্বের দিকে থাকে। সকলের মধ্যে যে পরমাত্মা তাকেই পেতে হবে, সংসারের কী প্রয়োজন !

সাধক যথাযোগ্য আচরণ করবেন, কিন্তু গুরুত্ব দেবেন পরমাত্মতত্ত্বের উপর, আচরণের প্রতি নয়। আচরণের প্রতি যদি কেউ সম্মান দেখায় তো তাতে কী হল ? কেউ তাকে অসম্মান করলো তো তাতেই বা কী হল ? যে সম্মান দেখায় সে আমাদের পুণ্য ক্ষীণ করে

দেয় আর যে অনাদর করে সে আমাদের পাপ নষ্ট করে দেয়। কিসে আমাদের লাভ—পাপ রাখায়, না কষ্ট করায় ? যে আমাদের দুঃখ দেয়, অপমান করে, নিন্দা করে, তিরস্কার করে সে আমাদের পাপ নাশ করে। যে আমাদের আদর-সৎকার করে আমাদের বাহবা দেয় সে আমাদের পুণ্য নাশ করে। আমরা পাপ দূর করতে উদ্যোগী হই, কিন্তু যে আমাদের অনাদর করে সে নিজে থেকেই আমাদের পাপ দূর করে দেয়। এটি তার কত বড় কৃপা ! আমাদের প্রতি কৃপা করার অভিপ্রায় তার নয়, কিন্তু ওই ক্রিয়ায় আমাদের লাভই হয়ে থাকে। সে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী নয়, কিন্তু আমাদের হিতে তো সে রত রয়েছে। সে যা করে তা আমাদের পক্ষে ঠিক, বেঠিক হতেই পারে না।

একটি সার কথা হল, সাধকের কাছে কোনো পরিস্থিতিই ক্ষতিকারক নয়। সংসারে যা কিছু সবই সাধন সামগ্রী। সুখদায়ক-দুঃখদায়ক, অনুকূল-প্রতিকূল যা কিছু সামনে আসে সবই সাধন-সামগ্রী। এইজন্য সাধককে সাবধান থাকতে হবে। সাধক তিনিই যিনি সব সময় সাবধান থাকেন।

দিলমে জাগ্রত রহিয়ে বন্দা।
হেত প্রীত হরিজন সুঁ করিয়ে, পরহরিয়ে দুখদ্বন্দ্বা।।

যখন ভালোমন্দ হয়, রাগ এবং দ্বেষ হয় তখন আমরা যেন সজাগ থাকি ! অতএব আমি সাধক আর আমার সাধ্য পরমাত্মা—এই জাগৃতি রেখে সাধ্যকে লাভ করবার জন্য যথাযোগ্য আচরণ করতে হবে।

অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করার উপায়

রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়, আসে-যায়। কিন্তু আপনাদের উৎপত্তি-বিনাশ হয় কি, আপনারা কি আসা-যাওয়া করেন? না। তাহলে তো এইগুলি (রাগ-দ্বেষাদি দোষ) আপনাদের থেকে ভিন্ন হল, তাই না! ভিন্ন হওয়ায় এগুলি আপনাদের মধ্যে নেই—এই কথা নিশ্চিত হল। অতএব দৃঢ়তার সঙ্গে এই চিন্তা হওয়া উচিত যে এইগুলি আমাদের মধ্যে নেই। যদি এইগুলি আপনাদের মধ্যে থাকত তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা থাকতেন ততক্ষণ এগুলিও থাকত, আপনারা না থাকলে এগুলিও থাকত না। কিন্তু আপনারা থাকেন, এগুলি থাকে না। এগুলি আগন্তুক, আপনারা মোটেই আগন্তুক নন। আপনাদের ভাব (অস্তিত্ব) সব সময় থাকে। গভীর নিদ্রায় 'আমি আছি' এই রকম স্পষ্টভাব না হলেও জেগে উঠলে তা হয়—মনে হয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম এখন জেগে উঠেছি। আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন আমার অবিদ্যমানতা ছিল, এমন মনে হয় না। নিজস্ব ভাব তো সব সময় অনুভূতিতে থাকে এবং দোষগুলির আগমন প্রত্যক্ষরূপে আমাদের অনুভূতিতে আসে। এগুলির বিদ্যমানতা এবং অবিদ্যমানতা আমরা বুঝতে পারি। তাৎপর্য হল এই যে রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি আপনাদের স্বরূপের মধ্যে নেই, বরং আপনাদের মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়তে আছে। কিন্তু শরীরকে আমি বা আমার বলে মেনে নিলে এগুলির সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধের অবিদ্যমানতা অনুভূত হয় না।

দেখুন একটি কথা বলছি, আপনারা মন দিয়ে শুনুন। সংসারে যত কিছু জ্ঞান আমাদের হয়, তা সবই সাংসারিক পদার্থ শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণকে নিয়েই হয়। কিন্তু নিজস্বতার বোধ শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণকে সঙ্গে নিয়ে হয় না। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে সংসার

সম্পর্কে জ্ঞান পরিষ্কার হবে, একথা ঠিক ; কিন্তু স্বরূপের বোধ কেমন করে হবে ? এই সংশয় নিয়ে ভাবুন।

শ্রোতা—মহারাজ ! অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, তখন বোধ নিজে নিজেই হয়ে যাবে।

স্বামীজী—জড়-চেতন, সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য সম্পর্কে যে বিবেক তাকে গুরুত্ব না দেওয়াতেই বোধ হয় না। বিবেককে গুরুত্ব দিলে অবিবেক দূর হয়ে যাবে এবং বোধ হয়ে যাবে। সেই বিবেককে আপনারা প্রকাশিত করেননি। তাকে আপনারা উদ্বুদ্ধ করেননি। তাকে জাগ্রত করেননি, তাকে সম্মানিত করেননি, গুরুত্ব দেননি—এইটিই হয়েছে ভুল। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে হবেটা কী ? শুদ্ধ হলে একটি জিনিস হবে, এই দিকে (পারমার্থিক) রুচি হয়ে যাবে। আর কিছু হবে না।

একটি খুবই মার্মিক কথা, এই দিকে সাধকের মন যায় না, পরমাত্মতত্ত্বের অথবা স্বরূপের বোধ করণ-নিরপেক্ষ, করণ-সাপেক্ষ নয়। এইজন্য করণ শুদ্ধ হোক অথবা অশুদ্ধ, তা থেকে বিমুখ হলেই বোধ হয়ে যাবে।

শ্রোতা—অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হলে তার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কী হতে পারে ?

স্বামীজী—বাস্তবে সম্বন্ধ নেই, কিন্তু সম্বন্ধ মেনে নেওয়া হয়েছে। মেনে নেওয়া সম্বন্ধকে না মানলেই তা দূর হবে। এতে শুদ্ধি-অশুদ্ধির কী আছে ?

শ্রোতা—এই মান্যতা কী অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হলেও হতে পারে ?

স্বামীজী—অবশ্যই হতে পারে। আপনাদের মধ্যে এই ভাব যেন আসে যে আমাদের মুক্তি হোক, আমাদের বোধ জাগ্রত হোক। আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হোক, তার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হোক—এও আসলে

সম্বন্ধকে দৃঢ় করা। কাউকে যদি দূর করতে চান তাহলে এর অর্থ হল যে প্রথমে তার সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়া হয়েছে। যদি তার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া না হয় তাহলে কাকে দূর করা হবে ? অস্তিত্ব মানেন বলেই তো তার সঙ্গে আপনারা সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করতে চান। সম্বন্ধ আছে—এটি মেনে নিয়ে তারপর তাকে দূর করেন। আমি বলি যে সম্বন্ধই নেই। ওই (শাস্ত্রীয়) প্রণালীর সঙ্গে এই প্রণালীর এইখানেই এক বিশেষ পার্থক্য। যেমন, বেদান্ত-গ্রন্থগুলিতে আছে **'অধ্যারোপাপবাদ্যভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চয়তে'** অধ্যারোপ এবং অপবাদ এই দুটি নিষ্পপঞ্চের প্রপঞ্চ হয় অর্থাৎ পরমাত্মার বিবেচনা হয়। আমি বলি যখন অপবাদই করতে হবে তখন অধ্যারোপ আর কেন করেন ?

শ্রোতা—আমার এইটিই প্রশ্ন যে অন্তঃকরণের শুদ্ধি ছাড়া মান্যতা স্থায়ী হয় না।

স্বামীজী—আমি বলছি, স্থায়ী হয়। অন্তঃকরণকে নিয়ে করতে গেলে তা হবে না। দেখুন, সনকাদিরা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মন বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছে আর বিষয় মনে বাসা বেঁধেছে, তাহলে মনকে বিষয় থেকে কী করে আলাদা করব ? তিনি উত্তর দিলেন এই দুটি থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে দাও—**'মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৩।২৬)। আমিও তো এই কথা বলি। এই সাধনকে আপনারা কেন ধরছেন না ? এটি শাস্ত্রের কথা, আমার মনগড়া কথা নয়। আমি যার উপর খুব জোর দিতে চাই তা হল, একেই জোরে আঁকড়ে থাকতে হবে, অন্য কিছুকে নয়। অধ্যারোপ করুন, তাকে রাখুন, তারপর তাকে দূর করুন, এই ঝামেলার মধ্যে কেন জড়াচ্ছেন ? আমাদের মধ্যে তা নেই-ই। এতে সাধকদের তাড়াতাড়ি সিদ্ধি হয়, এইজন্য একেই সম্মান করুন। এই প্রণালী আমার ব্যক্তিগত নয় আর না এর উপর কারও প্রভুত্ব আছে। এটি সাধারণ কথা।

শ্রোতা—মহারাজ ! যেখানে জিজ্ঞাসা থাকে, মান্যতা থাকে, সেখানেই আমাদের ভোগে রুচি সৃষ্টি হয়।

স্বামীজী—ভোগে রুচি, সুখভোগে ইচ্ছা, এটিই হল ঘাতক। আপনারা এটি ত্যাগ করেন না। এই জন্যই সম্বন্ধ বিচ্ছেদের বিষয় কঠিন মনে হয়, নইলে এটি খুবই সুগম এবং সরল।

শ্রোতা—এই সুখভোগের ইচ্ছাই তো আসল ব্যাধি, মহারাজ !

স্বামীজী—এইটি যদি আসল ব্যাধি হয় তাহলে তাকে দূর করুন। বস্তুত এইটি আসল ব্যাধি এই জ্ঞান যখন আপনাদের হয়েছে তখন তা নিজে থেকেই দূর হয়ে গিয়েছে। চোখে যে কাজল লাগান হয় চোখ তা দেখতে পায় না। চোখ কাজলকে তখনই দেখতে পায় যখন তা চোখ থেকে দূরে, আঙুলে লেগে থাকে।

শ্রোতা—স্বামীজী ! দোষ কী তা জানি এবং তাকে দূর করতেও চাই। তাহলেও কেন তা দূর হয় না ?

স্বামীজী—যতক্ষণ পর্যন্ত সুখের ইচ্ছা থাকে, ততক্ষণ সেই দোষ দূর হয় না। সুখভোগের যতটা ইচ্ছা, ত্যাগের ততটা ইচ্ছা নেই। সুখভোগের ইচ্ছা খুবই প্রবল। তার তুলনায় ত্যাগের ইচ্ছা খুবই দুর্বল।

শ্রোতা—মহারাজ, এটি ঠিক যে সুখভোগের প্রতি রুচি বেশি।

স্বামীজী—তাহলে সুখভোগের রুচিকে দূর করুন, আর সেই রুচিকে দূর করতে হলে আপনাদের অভ্যাস করতে হবে। যদি অভ্যাস না করে 'এটি আমার মধ্যে নেই'—একথা মেনে নেন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে। বাস্তবে অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করার পরিবর্তে অন্তঃকরণ থেকে যদি সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করা যায় তবে তা তাড়াতাড়ি শুদ্ধ হয়ে যাবে। সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করলে যে শুদ্ধি হবে সেই শুদ্ধি অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করলে হবে না। শিশু মায়ের কোলে থেকে শুদ্ধ হয় না। মায়ের মোহাশ্রিত স্নেহের দ্বারা পালিত বালক মোহশূন্য হতে

পারে না। বাবার মোহ কম হয়, তাই বাবার কাছে যে বালক থাকে তার অধিক সংশোধন হবে। অধ্যাপকের মোহ আরও কম হয়। সেজন্য তাঁর কাছে থাকা বালকের সংশোধন আরও তাড়াতাড়ি হবে। তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্তের মোহ একেবারেই হয় না, এইজন্য তাঁর কাছে যদি কেউ থাকে তাহলে সে খুবই শুদ্ধ হয়ে যাবে, সংশোধিত হবে। এরূপে আপনারা যদি অন্তঃকরণকে নিজের বলে মানতে থাকেন তবে তা শুদ্ধ হবে না। 'আমার'—এই ময়লা তো লাগাতে থাকেন আর বলেন যে শুদ্ধ করে নেব। কী করে করবেন ? আমার কিছুই নয়—এই ভাবটি খুবই শুদ্ধ করে দেয় এবং তাড়াতাড়ি করে। এই কথাকে নিয়েই আমার প্রণালী ভিন্ন প্রকারের মনে হয়। সেই (প্রচলিত) প্রণালীও আমার পড়া এবং দেখা এবং এই প্রণালীও আমি দেখেছি। ওই প্রণালীতে সময় লাগে, তাড়াতাড়ি সিদ্ধি হয় না। আপনারাই ভেবে দেখুন, এত বছর ধরে সৎসঙ্গ করছেন, সাধন করছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধি কতজনের হয়েছে ? অশুদ্ধিকে যত্ন করে, নিজস্ব বলে মনে করে তাকে দূর করতে চাই। তাতে তো দূর হবে না। প্রকৃতপক্ষে এটি আপনার স্বরূপের মধ্যে নেই। **'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।'** (গীতা ১৩।৩১) অর্থাৎ শরীরে স্থিত থেকেও আপনার স্বরূপ শরীরে স্থিত নয়, কর্তা এবং ভোক্তা নয়। এইভাবে সোজা স্বরূপকে লক্ষ্য করানোই হল আমার পদ্ধতি। এটি কোনো নতুন কথা নয়।

শ্রোতা—কিন্তু স্বামীজী রামায়ণে তো জ্ঞানকে কঠিন বলা হয়েছে, আর আপনি বলছেন সরল।

স্বামীজী—আপনি যদি প্রমাণের উদ্ধৃতি করেন তাহলে আমি চুপ করে যাব। কিন্তু এই কথাকে মোটেই মেনে নেব না। আপনি রামায়ণের দোহাই দিলে তুলসীদাসের প্রতি হৃদয়ে শ্রদ্ধা থাকার কারণে আমি চুপ করে যাব। কিন্তু যা সরল তা কঠিন হবে কী করে ? তুলসীদাস এটিকে সরল বলেছেন—

নির্গুন রূপ সুলভ অতি সগুন জনে নহিঁ কোই।
সুগম অগম নানা চরিত সুনি মুনি মন ভ্রম হোই॥
(৭।৩৩ খ)

এটি কী আর কারও বাণী ? বলুন।

শ্রোতা—মহারাজ ! কথা তো বোঝা যায়। কিন্তু বোধগম্য হয়েও তা বোঝা যায় না।

স্বামীজী—ভাই, কথা ওই একটাই। তা হল—সুখভোগের ইচ্ছা। আপনারা এটি ত্যাগ করেন না। সুখভোগ করব এবং সংগ্রহ করব—এই দুটি জিনিস। আমার কাছে এত বস্তু হোক, টাকা-পয়সা হোক, আধিপত্য হয়ে যাক এবং এগুলির দ্বারা আমি সুখভোগ করতে থাকি এইটিই হল প্রধান বাধা। সুখ বাধক নয়, সংগ্রহও বাধক নয়। সুখ এবং সংগ্রহের যে ইচ্ছা, সেইটিই প্রধান বাধক। এই ইচ্ছার ফলে কোনো কিছুই লাভ হয় না এবং কোনো ক্ষতি হতে বাকি থাকে না। নরক, চুরাশি লক্ষ যোনি, সন্তাপ, জ্বালা, চিন্তা, ভয়—এই সবই ওই ইচ্ছার মধ্যে আশ্রয় করে আছে।

শ্রোতা—এই ইচ্ছাকে দূর করতে কী করতে হবে ?

স্বামীজী—কী করে অন্যের ভালো হবে ? অপরের সুখ কী করে হবে ? কেমন করে অপরের সম্মান হবে ? অন্যে আরাম পাবে কেমন করে ? এই ভাবকে জাগ্রত করুন। যেখানে নিজের সুখের ইচ্ছা, সেখানে অপরের সুখের ইচ্ছা জাগ্রত হলে, তার জন্য অনুরাগ জাগ্রত হলে নিজের জন্য সুখ ও সংগ্রহ করার ইচ্ছা দূর হয়ে যাবে। দূর না হলে আমাকে বলবেন।

যিনি অপরের কল্যাণে নিয়োজিত তিনি সগুণ এবং নির্গুণ—উভয় স্বরূপের বোধ লাভ করবেন, একথা ভগবান বলেছেন। সগুণ প্রাপ্তি সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।'** (গীতা ১২।৪) আর নির্গুণপ্রাপ্তি সম্পর্কে বলেছেন—

'লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ .... সর্বভূতহিতে রতাঃ।' (গীতা ৫।২৫)

সুধিবৃন্দ ! আপনারা যে জ্ঞানমার্গ মনে করে এই কথাগুলিকে দূরে সরিয়ে দেন, তা করবেন না। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি সকল যোগেই বিবেক উপযোগী। বিবেক না থাকলে আপনাদের সাধনা ঠিকভাবে হবে না। যে স্বর্গ চায়, সকামভাবে সিদ্ধ হতে চায় তার পক্ষেও বিবেক উপযোগী। কেন না তার শরীর তো এখানেই থেকে যাবে। তাহলে কে স্বর্গে যাবে ? এইজন্য যা বন্ধনের কারণ তাতেও বিবেক আবশ্যক। যে নিজের উদ্ধার চায় তার জন্য বিবেক তো খুবই উপযোগী। যারা একে উপেক্ষা করে তারা ভুল করে। ভগবান তো এই কথা দিয়েই গীতা শুরু করেছেন যে শরীর এবং শরীরী, দেহ এবং দেহী এক নয়। এইটিই বাস্তব। এই বাস্তবিকতাকেই তো অনুভব করতে হবে ? এটি যদি অনুভব না করেন তাহলে আর কী অনুভব করবেন ?

শ্রোতা—বিবেক কী পরমাত্মার স্বরূপ ?

স্বামীজী—হ্যাঁ, স্বরূপ হয়ে যায়। বিবেক দুটি জিনিসের নাম আর পরমাত্মা হলেন এক। বিবেক পরমাত্মায় পরিণত হয়ে যায়। বিবেকের স্থানে পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন।

শ্রোতা—বিবেককে কী করে জাগ্রত করা যায় ?

স্বামীজী—এ নিয়েই তো আমি এত চেষ্টা-চরিত্র করছি। আপনারা এবং আমি মিলিতভাবে এখন কী করছি ? বিবেককে জাগ্রত করার কথাই তো আলোচনা করছি। বিবেকের জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন নেই। আছে বিচারের। অভ্যাসের ফলে মুক্তি হয় না এবং বিচারের ফলে মুক্তি বাকি থাকে না।

মুক্তি সহজ

একটি কথা বলছি। কথাটি খুবই মনোযোগ দেবার মতো এবং খুবই সরল। যাকে জীবন্মুক্তি বলা হয়, তত্ত্বজ্ঞান বলা হয় তার অনুভূতি তখনই হয়ে যায়—এইরকমই কথা। অনুভূতিও খুবই সহজ-স্বাভাবিক, যেমন—**'সংকর সহজ সরূপু সম্হারা। লাগি সমাধি অখণ্ড অপারা॥'** (শ্রীরামচরিতমানস ১।৫৮।৪)। আপনাদের সেদিকে কেবল দৃষ্টি দিতে হবে। আর কিছুই করতে হবে না। আপনাদের সকলেরই সেই অনুভূতি রয়েছে, কিন্তু আপনাদের সে দিকে লক্ষ্য নেই। আপনারা সেটিকে গুরুত্ব দেন না, এইটুকুই বুঝবার কথা।

ভাই ও বোনেরা, সকলে মন দিয়ে শুনুন। বাল্যাবস্থা থেকে আপনাদের শরীরের পরিবর্তন হয়েছে, ভাবের পরিবর্তন হয়েছে, চিন্তার পরিবর্তন হয়েছে, দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা সব বদলে গিয়েছে, কিন্তু আপনারা কি বদলেছেন ? আমি বদলে গিয়েছি একথা কেউ স্বীকার করবে না। শরীরের পরিবর্তনকে নিজেদের পরিবর্তন বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু শরীর বদলায়, আপনারা বদলান না। শরীরের পরিবর্তনের জ্ঞান আপনাদের আছে। বাল্যাবস্থা, যুবাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থা শরীরের হয়েছে, আপনাদের অবস্থার পরিবর্তন কোথায় হয়েছে ? আপনারা তো অবস্থাকে জানেন। যা জানা যায় সেটি বদলায়, জ্ঞাতা বদলায় না। কেবল এটি বুঝে নিতে হবে যে আমি পরিবর্তনশীল নই। এতে পরিশ্রম কোথায় ?

'ঈস্বর অংস জীব অবিনাসী'—এই অবিনাশী অবস্থাকে আপনারা অনুভব করুন, সেটি হল—শরীর বিনাশশীল আর আমি অবিনাশী। এইটুকুই কথা। কোনো লম্বা-চওড়া কথা নয়। পরিবর্তনশীল-এ আমার

অবস্থান নেই, প্রত্যুত তা হল শরীরের। বাল্যাবস্থা, যুবাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থা—এই তিনটি অবস্থার জ্ঞান আপনাদের রয়েছে, শরীরের সেই জ্ঞান নেই। অনুভব আপনারা করেন, শরীর তো অনুভব করে না। অনুরূপভাবে জাগৃতি, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অনুভূতিও আপনাদের রয়েছে। আপনারা জাগ্রত অবস্থাতেও থাকেন, স্বপ্নেও থাকেন, সুষুপ্তিতেও থাকেন।

আপনারা জাগ্রত অবস্থায় এবং স্বপ্নের মধ্যে থাকেন—এই অনুভূতি তো আপনাদের হয়, কিন্তু আপনারা যে সুষুপ্তির মধ্যেও থাকেন সেটি অনুভব করতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমি একটি সহজ কথা বলছি। আমি কোথায় ঘুমিয়ে রয়েছি, কখন ঘুমিয়েছি এই জ্ঞান সুষুপ্তির (গাঢ় ঘুম) মধ্যে হয় না। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় এবং স্বপ্নের মধ্যে দেশ, কাল প্রভৃতির জ্ঞান থাকে। অতএব দেশ, কাল প্রভৃতির অ-ভাবের জ্ঞানও আপনাদের মধ্যে আছে এবং এগুলির ভাবের জ্ঞানও আপনাদের মধ্যে আছে। সুষুপ্তির সময় এইগুলির অ-ভাবের অনুভূতি হয় না, কেননা সেইসময় অনুভব করবার করণ অর্থাৎ যন্ত্রপাতি (অন্তঃকরণ-বহিঃকরণ) থাকে না, সেগুলি অবিদ্যায় লীন হয়ে যায়। কিন্তু সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠলে আপনারা অনুভব করেন যে আপনারা তাই রয়েছেন—যা সুষুপ্তির আগে ছিলেন, তবে মাঝে আপনাদের কোনোই হুঁস ছিল না, অতএব সুষুপ্তির সময় জাগৃতি ও স্বপ্নের জ্ঞানের অবিদ্যমানতা ছিল কিন্তু আপনারা অবিদ্যমান ছিলেন না। যদি আপনারা অবিদ্যমান হতেন তাহলে 'আমার কিছু জানা নেই' একথা কে বলত ? এমন গাঢ় ঘুম হয়েছিল যে আমার কিছুই মনে না থাকলেও 'কিছু মনে নেই' এই জ্ঞান তো থাকে। যেমন, বাইরে থেকে কেউ জিজ্ঞেস করল যে অমুক লোক কি বাড়িতে আছেন ? ভিতর থেকে একজন লোক উত্তর দিলেন, অমুক লোক বাড়িতে নেই। কিন্তু একথা যিনি বললেন তিনিও

কি নেই ? যদি উত্তরদাতাও না থাকতেন তাহলে 'অমুক লোক বাড়িতে নেই' একথা কে বলত ? তেমনই সুষুপ্তির মধ্যে আপনি যদি না থাকতেন তাহলে 'আমার কিছুই মনে নেই' একথা কে বলত ? জাগৃতি এবং স্বপ্নে জ্ঞান থাকে আর সুষুপ্তিতে জ্ঞান থাকে না। অর্থাৎ জ্ঞানের ভাব এবং অ-ভাব দুটির জ্ঞানই আপনাদের মধ্যে আছে ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল এই যে আপনারা অবস্থাগুলিকে চিহ্নিত করেন। জাগৃতি, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা সম্পর্কেই আপনাদের জ্ঞান আছে। তাই আপনারা এগুলিকে চিহ্নিত করতে পারেন। যদি এই তিনটির মধ্যে আপনারা না থাকতেন, এই তিনটি সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞান যদি না থাকত তাহলে কে এগুলি চিহ্নিত করত ? অতএব বাল্যাবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত সকল অবস্থায় এবং জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাতেও আপনারা থাকেন, কিন্তু এই অবস্থাগুলি থাকে না। যা থাকে না তা হল সংসার এবং শরীর আর যা থাকে তা হল পরমাত্মার সাক্ষাৎ অংশ। 'আমি অবিনাশী'—এই জ্ঞান অনুভব করানোর জন্যই আমি এই কথা বলছি। আপনাদের সামনে আজও অবস্থাগুলি বিনাশশীল। পরিস্থিতি বিনাশশীল, ঘটনাবলি, দেশ-কাল এবং ক্রিয়া সবই বিনাশশীল কিন্তু আপনারা অবিনাশী, আপনারা দেশ, কাল, ক্রিয়া, বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতি সব কিছুর বিদ্যমানতা এবং অবিদ্যমানতা জানেন। আপনারা অবিনাশী, আপনারা হলেন চৈতন্য, নির্মল এবং সহজ সুখরাশি—

ঈশ্বর অংস জীব অবিনাশী। চেতন অমল সহজ সুখরাসী॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭।১)

আপনারা চেতন। চেতন কাকে বলা হয় ? স্থূলরীতিতে যার মধ্যে প্রাণ আছে তাকে চেতন বলা হয়। কিন্তু প্রাণ চেতনের লক্ষণ নয়, কেননা প্রাণ হল বায়ু, জড়। চেতনের লক্ষণ হল জ্ঞান। জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির জ্ঞান আপনাদের হয়, তাই আপনারা হলেন চেতন। স্বপ্ন

এবং সুষুপ্তি অবস্থার জ্ঞান জাগ্রত অবস্থায় হয় না। জাগ্রত এবং সুষুপ্তি অবস্থার জ্ঞান স্বপ্ন অবস্থায় হয় না। জাগ্রত এবং স্বপ্ন অবস্থার জ্ঞান সুষুপ্তি অবস্থায় হয় না। অবস্থাগুলির কোনো জ্ঞান নেই। শরীরের কোনো জ্ঞান নেই। জ্ঞান আছে আপনাদের। অতএব আপনারাই হলেন জ্ঞানস্বরূপ, আপনারাই হলেন চেতন।

আপনারা হলেন নির্মল। রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, অনুকূলতা-প্রতিকূলতা প্রভৃতি যত বিকার এই সবগুলি হল মল। যত কিছু মল (বিকার) সবই অবস্থাগুলির মধ্যে নিহিত। জাগৃতিতে মল, স্বপ্নে মল, সুষুপ্তিতে মল (অজ্ঞান), কিন্তু আপনারা নির্মলই থাকেন। আপনারা তিনটি অবস্থার জানকারী। দোষ আপনাদের মধ্যে নেই। আপনারা দোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের দোষী মনে করেন। দোষ হল আগন্তুক, আপনারা আগন্তুক নন—এটি প্রত্যক্ষ। দোষ নিরন্তর থাকে না, কিন্তু আপনারা নিরন্তর থাকেন। শোক-চিন্তা, ভয়-উদ্বেগ, রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক এগুলি সব আসে-যায় এবং অনিত্য—**'আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত'** (গীতা ২।১৪)। ভগবান কী সুন্দর কথা বলেছেন, যা কিছু আসা-যাওয়া করে সেগুলিকে সহ্য করো, সেগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ো না। সুখ আসে-যায়, দুঃখও আসে-যায়। কিন্তু যারা আসা-যাওয়া করে আপনারা তাদের জানেন।

আপনারা সহজ সুখরাশি। সুষুপ্তিতে কোনো ঝামেলা থাকে না, কোনো দুঃখ থাকে না। আপনারা টাকা-পয়সা না থাকলেও থাকতে পারেন, ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হয়েও থাকতে পারেন, আপনারা সাংসারিক ভোগ ছাড়াও থাকতে পারেন, কিন্তু ঘুম না হলে থাকতে পারেন না। ঘুম না হলে তো আপনারা পাগল হয়ে যাবেন। এইজন্য যাতে ঘুম হয় ডাক্তার বদ্যিদের সেজন্য বড়ি দিতে বলেন। ঘুমে কী পাওয়া যায় ? সংসারের অবিদ্যমানতার সুখ পাওয়া যায়। যদি জাগ্রত

অবস্থাতে সংসারের অবিদ্যমানতার জ্ঞান হয়ে যায়, সংসারের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে জাগ্রত অবস্থাতেই দুঃখ দূর হয়ে যাবে, আর পরমাত্মাতে স্থিতি হয়ে গেলে আনন্দ লাভ হবে। একেই মুক্তি বলা হয়।

দুঃখ কোথায় ? সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধেই দুঃখ। জাগৃতিতে এবং স্বপ্নে সংসারের সম্বন্ধ থাকে। এইজন্য শান্তি পাওয়া যায় না। সংসারকে ভুলে গেলে শান্তি পাওয়া যায়। যদি সংসারকে ত্যাগ এবং পরমাত্মাতে স্থিতি হয়ে যায় তাহলে কতই না আনন্দ হবে! কেবল ভুলে গেলেই সুখ পাওয়া যায়। শুধু ভুললেই মনে শক্তি আসে, বুদ্ধি শক্তি লাভ করে, ইন্দ্রিয়গুলি শক্তি লাভ করে, শরীরে শক্তি আসে। কিন্তু সংসারের সঙ্গে থাকলে মনে ক্লান্তি আসে, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ক্লান্ত হয়ে যায়। গাঢ় ঘুমে সংসারের অবিদ্যমানতা অনুভূত হয়। সেই ঘুম ছাড়া আপনারা অষ্ট প্রহরও থাকতে পারেন না। এখনকার একটি কথা আমি শুনেছি। আগেকার দিনে অপরাধীদের মারধোর করে সত্য কথা বলানো হত। কিন্তু আজকাল তাদের ঘুমোতে দেওয়া হয় না। ফলে তারা সত্য কথা বলে ফেলে। ঘুমোতে না দেওয়া হলে অপরাধী এমন অস্থির হয়ে পড়ে যে সত্য কথা বলে ফেলে। মারধোর করলে তাড়াতাড়ি তার সত্য কথা বের করানো যায় না। সুতরাং না ঘুমান কোনো সাধারণ দুঃখ নয়। ঘুমে খুব বেশি সুখ পাওয়া যায়। আপনারা বলেন যে, এত সুখে ঘুমিয়েছি যে কোনো কিছু খেয়ালই ছিল না। তাহলে কীসের দুঃখ ? দুঃখ হল সংসারের সম্বন্ধের। অতএব আপনারা হলেন সুখরাশি। যদি সুখরাশি না হন তাহলে ঘুমোতে চান কেন ? কেন বিশ্রাম চান ? অষ্ট প্রহর ধরে কাজ কর্ম করুন। নিদ্রায় শরীর বিশ্রাম লাভ করে, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়—এরাও বিশ্রাম পায়। সংসারকে ভুলে গেলে আনন্দ লাভ হয়। যদি সংসারের (সম্বন্ধ) ত্যাগ করেন তাহলে খুবই আনন্দ লাভ করবেন এবং স্বরূপে স্থিতি লাভ করবেন। স্বরূপে আপনাদের স্থিতি

স্বতঃস্বাভাবিক এবং স্বরূপে পরম আনন্দ রয়েছে।

আপনারা অবিনাশী, চেতন, অমল এবং সহজ সুখরাশি। যদি আপনারা অবিনাশী না হতেন তাহলে বাল্যাবস্থা, যুবাবস্থা এবং বৃদ্ধাবস্থা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞান হত না। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা এবং সমাধি-অবস্থারও জ্ঞান হত না। আপনারা সদাসর্বদা থেকে যান আর এই অবস্থাগুলি সর্বদা থাকে না। এগুলি আপনাদের সঙ্গী নয় এবং আপনারাও এদের সঙ্গী নন। এদের সঙ্গে থাকা হল অজ্ঞান আর এদের সঙ্গে না থাকা, এদের সঙ্গের অবিদ্যমানতা অনুভব করা হল জ্ঞান, বোধ, জীবন্মুক্তি। এটি সকলের দ্বারা অনুভূত। এখন কেবল এই জ্ঞানকে গুরুত্ব দিতে হবে।

আপনারা টাকা-পয়সা, ভোগাদি, শরীর, আত্মীয়স্বজন, জমি-বাড়ি এইসবকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই যে বিনাশশীল জিনিসগুলির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, এইটিই হল অনর্থের মূল। যার কোনো গুরুত্ব নেই, যা ক্ষণভঙ্গুর, যা এক মুহূর্তও স্থির থাকে না তাকে তো আপনারা গুরুত্ব দিয়েছেন আর আপনারা (স্বয়ং) যে নিরন্তর থাকেন তাকে গুরুত্ব দেন না। বাস্তবে এইটিই তো মহত্ত্বের কথা। তাৎপর্য হল, এই বিবেককেই গুরুত্ব দিতে হবে। পরিস্থিতি প্রভৃতি সবই বদলে যায়। কিন্তু আপনারা বদলান না। আপনারা তেমনই থেকে যান। সব কিছু অবিদ্যমান হলেও আপনারা সুখ অনুভব করেন। ঘুমের সময় আপনারা জগৎ সংসারকে ভুলে যান, তাতে সতেজতা আসে, সুখ হয়। এইভাবে আপনারা জাগ্রত অবস্থাতে নিজেদের মধ্যে স্থিত হয়ে যান। আমি সমাধির কথা, অন্তঃকরণের একাগ্রতার কথা বলছি না। আপনাদের স্ব-স্বরূপে স্থিতি স্বতঃসিদ্ধ। জাগৃতিতে, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে, মূর্ছায়, সমাধিতে—কোনো অবস্থায় আপনাদের স্থিতি নেই ? আপনাদের স্থিতি যে স্বতঃসিদ্ধ তাকে চিনুন। যা আসে-যায় তার সঙ্গে মিলিত হতে হবে না, এরই নাম জ্ঞান।

সেগুলির সঙ্গে মিলিত হওয়ার নাম হল অজ্ঞান। এইটুকুই কথা। অনেক বই পড়লেই বোধ হবে না। এই কথাটিকে যদি মেনে নেন তাহলে বোধ হবে। বাস্তবে এটি ব্যক্তিগত কথা নয়, এটি সকলের কথা। সকলের অনুভূতির কথা।

শ্রোতা—কথা তো স্পষ্ট বোঝা যায়, কিন্তু আচরণের সময় এত গুলিয়ে যায় যে মনে হয় বিবেক যেন লুপ্ত হয়ে গেছে !

স্বামীজী—আচরণে জাগৃতি থাকে না, এর কারণ কী ? তার কারণ আচরণের সময় আপনারা আগত বিনাশশীল বস্তুগুলির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। ধরা যাক, আপনাদের খুবই খিদে পেয়েছে, আর সিনেমার পর্দায় আপনাদের মনের মতো খাবার আপনারা দেখছেন, তখন সেগুলিকে খেতে মন চায় কি ? জিভে জল আসবে, খাওয়ার কথা মনে আসবে, কিন্তু সেগুলিকে খেতে মন চাইবে কি ? আপনাদের তেষ্টা পেয়েছে, আর পরদায় ঠাণ্ডা জল দেখা যাচ্ছে, গঙ্গা প্রবাহিত, কিন্তু তাকে কি পান করতে ইচ্ছা করে ? করে না। কারণ সেগুলিকে আপনারা গুরুত্ব দেননি।

শ্রোতা—সিনেমায় তো নিশ্চিত হয়ে যাই ওই জিনিসগুলি আসলে নেই।

স্বামীজী—সুধীবৃন্দ ! আমি তো এই কথাই বলেছি যে এইগুলির অবিদ্যমানতা নিশ্চিত করুন। জাগ্রত অবস্থা নেই, স্বপ্ন অবস্থা নেই, নেই সুষুপ্তি, মূর্ছা, সমাধিও। এইগুলির অবিদ্যমানতা অনুভব করুন। ব্যস, কেবল এইটুকুই বলার। যেমন, সিনেমায় অবিদ্যমানতা অনুভব হয়, কেননা সেগুলির পরিবর্তন আপনারা প্রত্যক্ষ করেন কিন্তু আপনারা বদলান না। আমি এই কথা অনেক বার বলেছি। শত সহস্র বার বলেছি যে এই শরীর ও সংসারের সঙ্গে আগে কোনো সম্পর্ক ছিল না, ভবিষ্যতেও এগুলির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না এবং তৃতীয়

কথা যে এখন সম্বন্ধ দেখা গেলেও এগুলি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। এগুলির পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আপনাদের রয়েছে। আজ পর্যন্ত এত বছর আমরা বেঁচে আছি—এই কথাটিই ভুল। বেঁচে নেই, বরং মরে গেছি। জন্মাবার পরেই মৃত্যু শুরু হয়ে গিয়েছে। শিশু দু'বছরের হল। তার মানে তার জীবনকাল থেকে দু বছর কমে গেল। প্রত্যক্ষ বিষয় হল, এই শরীর আগে ছিল না, পরেও থাকবে না এবং বর্তমানে না থাকার দিকে যাচ্ছে। অতএব জগৎ-সংসার হল 'নাস্তি'-রূপ। **'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)—অ-সতের তো সত্তা নেই আর সৎ-এর অবিদ্যমানতা নেই। আপনারা হলেন সৎরূপ, এবং অ-সৎরূপ জগৎ সংসারের জ্ঞাতাও। যা ভাসিত হচ্ছে—এটি নেই। যদি এর সত্তা থাকত তাহলে এটি টিকে থাকত। বাল্যাবস্থা সত্য হলে থেকে যেত। যুবাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থা, ধনবত্তা, নির্ধনতা সত্য হলে সেগুলি থেকে যেত। কিছুই থাকে না। এই অনিত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আপনাদের আছে। তাকেই সম্মান করুন, গুরুত্ব দিন, এখানে কঠিনতা কোথায় ? একে গুরুত্ব দেন না বলেই ভুলে যান। আপনাদের একশ টাকা যদি হারিয়ে যায় তাহলে কি আপনারা ভুলে যাবেন ? কয়েক বারই মনে পড়বে যে টাকা হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু জ্ঞান চলে গেলে আপনারা পরোয়া করেন না।

শ্রোতা—মহারাজ ! পদার্থের প্রতি আসক্তি থাকলে তার সত্তার অবিদ্যমানত্ব হয় না।

স্বামীজী—আমি বলি আহারে আসক্তি থাকা সত্ত্বেও সিনেমার পর্দার আহারের সত্তার অবিদ্যমানত্ব কেমন কর হল ?

শ্রোতা—পদার্থ নেই এটি তো ওখানে পরীক্ষিত হয়েছে।

স্বামীজী—আচ্ছা, এই যে দেখছেন, এই পদার্থগুলির সত্তা আছে কি ?

শ্রোতা—এটি খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

স্বামীজী—এটির অবিদ্যমানতা ভালোভাবে বোঝবার চেষ্টাই আপনারা করেননি। সিনেমার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই জানেন যে এগুলি নেই। কিন্তু এখানে প্রথম থেকেই এগুলি আছে বলে মেনে নেন। এই যে 'আছে' এটি আপনাদের তৈরি, এগুলি 'আছে' নয়।

শ্রোতা—সংসারের 'অস্তি'ভাব মনের মধ্যে গেঁথে আছে। তা বার হচ্ছে না। ব্যাপারটি এখানেই আটকে আছে !

স্বামীজী—ভালো কথা। এখন মন দিয়ে আপনারা শুনুন। 'অস্তি' ভাব অর্থাৎ সত্তা দুরকমের হয়। একটি সত্তা সব সময় থাকে এবং আর একটি সত্তা উৎপন্ন হওয়ার পরই থাকে[১]। আপনাদের সত্তা চিরকাল থাকে আর শরীর-সংসারের সত্তা সৃষ্টি হওয়ার পর থাকে, চিরকাল থাকে না। আপনারা বলেন সত্তা দূর হয় না, আমি বলি সত্তা থাকে না।

নদীর তীরে একজন সাধু দাঁড়িয়েছিলেন। লোকেরা বলল, মহারাজ দেখুন, নদী বয়ে চলেছে আর ওখানে পুলের উপর মানুষেরাও বয়ে চলেছে। সাধু বললেন, পুলও বয়ে চলেছে ! যেমনভাবে নদী প্রবাহিত হচ্ছে, মানুষের প্রবাহ চলেছে, তেমনভাবে পুলও প্রবাহিত হচ্ছে। লোকেরা বলল একথা কী করে মেনে নেব ? সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, যেদিন পুল নির্মিত হয়েছিল আজও কি তা তেমন নতুন আছে ? তাহলে এটা প্রবাহিত হয়েছে, কি না ? সম্পূর্ণ প্রবাহিত হলে ভেঙে যাবে। এইভাবে সংসারও প্রবাহিত হচ্ছে। সংসারের সত্তা উৎপন্ন এবং নষ্ট হয়ে যায়। এই সত্তাকে আপনারা গুরুত্ব দিয়েছেন আর যে সত্তা চিরকাল থাকে তাকে গুরুত্ব দেননি। শরীর-সংসারের সত্তা তো নিজেদের সামনে সৃষ্টি হয় এবং নষ্ট হয়ে যায়। অতএব চিরকাল থাকে

---

[১] এই বিষয়ে বিস্তৃত জানার জন্য 'গীতা দর্পণ'-এর অন্তর্গত 'গীতায় দ্বিবিধ সত্তার বিবরণ' শীর্ষক লেখাটি পড়ুন।

যে সত্তা তাকে গুরুত্ব দিন।

শ্রোতা—আসক্তি থাকা সত্ত্বেও 'সংসার নেই' এটি কী নিশ্চিত হবে ?

স্বামীজী—আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার বলার পর অবিদ্যমানতা সম্পর্কে আপনাদের কোনো জ্ঞান হল কী না ?

শ্রোতা—হয়েছে।

স্বামীজী—তাহলে এখন কি আসক্তি দূর হয়েছে ?

শ্রোতা—না হয়নি।

স্বামীজী—তাহলে আসক্তি থাকলেও অবিদ্যমানতার জ্ঞান তো হয় ? আপনারা রাগ-দ্বেষ নিয়ে চিন্তা করবেন না, বিদ্যমান ও অবিদ্যমান নিয়ে চিন্তা করুন। সহজ কথাটি বলছি। রাগ-দ্বেষ দূর না হলে কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু এদের কোনো সত্তা নেই, এই কথাটি তো মেনে নিন। সংসারেরই যখন সত্তা নেই তখন রাগ-দ্বেষ কী করে থাকবে ? দূর হবেই। আপনারা রাগ-দ্বেষ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, এগুলিকে মন থেকে হটিয়ে দিন। আসক্তি আসলে আসবে, কোনো চিন্তা নেই। বিদ্বেষ হল তাতেও কোনো চিন্তা নেই। রাগ-দ্বেষ অর্থাৎ অনুরাগ-দ্বেষকে ধরে থাকবেন না। যা জন্মায় তা নষ্ট হয়ে যায়। আসক্তির সত্তাও জন্মায়। বিদ্বেষের সত্তাও জন্মায়। পদার্থগুলির জন্মগ্রহণকারী সত্তা হয়। এই সত্তা বাস্তবে সত্তা নয়। এতে বাধা কোথায় ?

শ্রোতা—সংসারকে ভুলব কী করে ?

স্বামীজী—যেমন করে ঘুমিয়ে পড়লে সংসারকে ভুলে যান। এখন যেমন আমার কথা শুনছেন, নিজেদের ঘরের কথা কি মনে আছে ? এখন মনে করিয়ে দেওয়ায় মনে পড়ল, নইলে তো ভুলেই গিয়েছিলেন। এইভাবেই সংসারকে ভুলে যান। যা বিনাশশীল তাকে

ভুলে যাওয়ার, তার অবিদ্যমানতার অনুভূতি তো হয়, কিন্তু এই অনুভূতিকে আপনারা গুরুত্ব দেন না। আপনারা সংসারের অ-ভাব এবং ঈশ্বরের ভাবকে গুরুত্ব দেন না। সংসারের অ-ভাব এবং পরমাত্মার ভাবের জ্ঞান তো আপনাদের আছে। অতএব এখন দয়া করে এই জ্ঞানকে গুরুত্ব দিন। নদীর উপর বালির বাঁধ নির্মাণ করলে কি তা স্থায়ী হবে ? এই রাগ-দ্বেষ তো বালির ভিত এবং সংসার নদীর মতো প্রবাহিত হচ্ছে। প্রবাহমান সংসারে এই রাগ-দ্বেষ কী করে থাকবে ? এইটুকু মনে রাখুন যে এগুলি প্রবহমান, এগুলি থাকার নয়। সুখদায়ী এবং দুঃখদায়ী যে পরিস্থিতিই আসুক তা থাকার নয়। এই কথাটুকু মনে রাখলে সহজেই মহান অনুভূতি হয়ে যাবে। বোধ হয়ে যাবে।

মুক্তির সরল উপায়

যা বাস্তবিক কথা তাকে মেনে নিতে কি জোর লাগে ? যেমন, এটি হল গীতাভবন। এটিকে মেনে নিতে কি কোনো পরিশ্রম লাগে ? এই যে গঙ্গা প্রবাহিত—এটি মেনে নিতে কি কোনো জোর লাগে ? সত্য কথাকে যেমনকার তেমন মেনে নিতে কীসের বাধা ? এই রকমই একটি কথা আপনাদের জানান হচ্ছে। ভগবান বলেছেন—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭) 'এই জীব আমার অংশ' আর তুলসীদাস লিখেছেন—**'ঈশ্বর অংস জীব অবিনাশী'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭।১)। অতএব আপনারা যদি নিজেদের ঈশ্বরের অংশ, তাঁর সন্তানসন্ততি বলে মেনে নেন তো তাতে জোর কতটা দিতে হয় ? শাস্ত্রে ভগবানেরই মহিমা আছে এবং তার চেয়েও বেশি আছে সাধু-মহাত্মাদের মহিমা। ভগবান এবং সাধু-মহাত্মা উভয়েই বলেন যে জীব পরমাত্মার অংশ। আপনাদের জন্ম যে কোনো বংশেই হোক, যে কোনো সম্প্রদায়েই হোক, আপনাদের মধ্যে যে যোগ্যতাই থাকুক, আপনারা লেখাপড়া জানুন বা না জানুন, কিন্তু আপনারা পরমাত্মারই অংশ। পুত্র তো পুত্রই থাকে। সে সুপুত্রই হোক আর কুপুত্রই হোক, কিন্তু পুত্র হওয়ার মধ্যে কি কোনো তফাৎ হয় ? কুপুত্র কি পুত্র নয় ? তেমনই আমরা যেমনই হই ভগবানেরই থাকি। মা-বোনেরা আন্তরিকভাবে আপনারা মেনে নিন যে আপনারা ভগবানের আদরের মেয়ে। এই রকম মানতে কি জোর লাগে ? মূলে, আদিতে এটি সত্য কথা। ভগবানের অংশ বলুন আর সন্তানসন্ততি বলুন একই কথা। সংসারে মা-বাবা তো প্রত্যেক বার সন্তান জন্মাবার সময় বদলে যান। কিন্তু ভগবানের কি কোনো পরিবর্তন হয় ? আমরা সেই

ভগবানেরই। ভালো-মন্দ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, পুণ্যাত্মা, পাপী, যেমনই হই না কেন, আমরা ভগবানেরই। এখন এই কথাটি মেনে নিতে বাধা কোথায় ? এতে কীসের অপমান ? আপনাদের কি মেনে নিলে সম্মানহানি হয় ?

কেউ যদি রেলে কাজ করে তাহলে সে বলে যে, সে হল রেলের কর্মচারী, ব্যাঙ্কে কাজ করলে বলে ব্যাঙ্কের কর্মচারী, কোনো দোকানে কাজ করলে বলে যে, অমুক দোকানের কর্মচারী, কোনো কারখানায় কাজ করলে বলে অমুক কারখানার শ্রমিক। সে কি মা-বাবার না হয়ে রেলের হয়, ব্যাঙ্কের হয় ? কেউ কি বলতে পারে যে সে মা-বাবার নয়, সে হল রেলের। মা-বাবার নয় ব্যাঙ্কের ? সে তো মা-বাবার থাকেই। এমনিতে আপনারা যখন মনুষ্যশরীরে এসেছেন তখন ভগবানের হয়েই এসেছেন। গীতাতে আছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

(২।২২)

'মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র পরিধান করে তেমনিভাবে জীবাত্মা পুরাতন শরীরকে ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীরে চলে যায়।'

কাপড় বদলালে মানুষ কি দর্জির হয়ে যায় ? তেমনই আপনারা মানুষের, পশুর, গাছের কিছু কাপড় পরে নিলেন, অনেক শরীর ধারণ করলেন, কিন্তু রইলেন ভগবানেরই। কথাটি যথার্থ। প্রকৃত সত্যও যদি না মানেন তাহলে কাকে মানবেন ? সত্যবাদীদের মধ্যেও ভগবান এবং তাঁর ভক্ত উভয়েরই খুব সম্মান—

হেতু রহিত জগ জুগ উপকারী। তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী॥

স্বারথ মীত সকল জগ মাহীঁ। সপনেহুঁ প্রভু পরমারথ নাহীঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৭।৩)

দুজনেই বলে যে আপনি পরমাত্মার। অতএব এই কথাটি মেনে নিন যে, **আমরা যেমনই হই, আমরা হলাম বড় ঘরের !** আমাদের ঘরানা কেমন তা মনে রাখুন। আমরা ভগবানের। ভগবান সব কিছু করতে পারেন। নরকেও পাঠাতে পারেন। স্বর্গেও পাঠাতে পারেন, চুরাশি লক্ষ যোনিতে পাঠাতে পারেন। কিন্তু 'এ আমার নয়' একথা বলতে পারেন না, অস্বীকার করতে পারেন না। ভগবানের কথা—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

(গীতা ১৬।১৯)

'বিদ্বেষকারী, ক্রূর স্বভাববিশিষ্ট এবং সংসারে ভীষণ নীচ অপবিত্র যেসব মানুষ তাদের আমি বার বার আসুরী যোনিতে পাঠাতেই থাকি।' কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, প্রভু তাদের আসুরী যোনিতে, নরকে পাঠাবার আপনার কী অধিকার ? তাহলে ভগবান এই কথাই বলবেন, তুমি জিজ্ঞাসা করার কে ? ওরা আমার। মা শিশুকে স্নান করালে শিশু কাঁদে, আপনারা তাঁকে যদি বলেন, শিশুটি কাঁদছে, তোমার কি দয়া হচ্ছে না ? তিনি বলবেন, যাও তো, তোমাকে ভাবতে হবে না। তেমনই '**জাহি বিধি রাখে রাম, তাহি বিধি রহিয়ে। সীতারাম সীতারাম সীতারাম কহিয়ে॥**' কত সহজ সরল কথা।

অস অভিমান জাই জনি ভোরে। মৈঁ সেবক রঘুপতি পতি মোরে॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৩।১১।১১)

যেমন ধনাঢ্য, রাজকীয় মানুষের গর্ব হয় 'আমি হলাম রাজপুরুষ' তেমনই আপনাদের মনেও এই গর্ব থাকা উচিত যে আপনারা হলেন

ভগবানের। ভগবান বলেন—'**সব মম প্রিয় সব মম উপজায়ে** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৮৬।২)। অতএব আমরা ভগবানের এব ভগবানের প্রিয়, আমরা সাধারণ নই। পৃথিবীর যে কেউ আপনাদে: ভালোমন্দ যাই বলুক, কিন্তু ভগবান বলেন, আমার সৃষ্ট সকলেই আমা: প্রিয়। কালো, কুরূপ ছেলের মাকে জিজ্ঞাসা করুন, ছেলে কেমন ? তাকে কি মায়েরও খারাপ লাগে ? অনুরূপভাবে জীব যেমনই হোক নরকেই থাকুক, কিম্বা বৈকুণ্ঠে থাকুক অথবা পৃথিবীতে, সে ভগবানের প্রিয়—'**সব মম প্রিয়**'। সুতরাং মনে এই উৎসাহ আসা চাই যে আমর ভগবানের, কত আনন্দের কথা ! আমরা অবিনাশী, চেতন, নির্মল এবং সহজসুখরাশি এই কথা বুঝুন বা না বুঝুন, কিন্তু এটি তো মানতে পারেন যে আমরা ভগবানের, কতই না আনন্দের কথা !

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব মম দেবদেব॥

কার নিজের ছেলেকে খারাপ লাগে ? নিজের মাকে কার খারাপ লাগে ? আমার মা-ও ভগবান, বাবা-ও ভগবান, এখানে আমাদের জন্ম অল্প কয়েক বছর হল হয়েছে এবং আর অল্প কয়েক বছর তা থাকবে না। এই যে হাড় মাংসের শরীর তা সবই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা ভগবানের এটি—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে না। আমরা যেখানেই যাই, যে কোনো যোনিতে যাই সেখানে ভগবানেরই থাকব। ভগবান বলেন, আমি তোমাকে নরকে পাঠাচ্ছি, তাহলে আমাদের যদি নরকে যেতে হয় তো ভগবান পাঠাচ্ছেন বলেই যেতে হবে। যে ভগবানকে নিজের এবং নিজেকে ভগবানের মনে করে সে কি কখনো নরকে যেতে পারে ? কখনোই যেতে পারে না। আর যদি যায় তো আপত্তি কী ? ভগবান যখন পাঠিয়েছেন তাহলে আর আপত্তি কেন !

[1]জয়দয়ালজী গোয়েন্দকা বলেছিলেন যে সুযোগ পেলে তিনি নরকে যাবেন। কেননা এখানে লোকেরা সাংসারিক সুখে মগ্ন রয়েছে বলে সৎসঙ্গের কথা শোনে না। কিন্তু যেহেতু নরকে ভয়ানক দুঃখ, অতএব সেখানকার প্রাণীরা আমার কথায় বেশি মনোযোগ দেবে। অতএব নরকে গিয়ে সৎসঙ্গ করলে খুবই ভালো।

মহাভারতের স্বর্গারোহন পর্বে আছে যে যখন দেবদূত যুধিষ্ঠিরকে নরকের রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিলেন তখন নারকীয় জীবেরা বলেছিল, মহারাজ যুধিষ্ঠির ! আপনি দাঁড়ান, আপনার শরীরের হাওয়া লাগলেও আমরা শান্তি পাই। এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন যে তিনি তো ওখানেই থাকবেন। যেখানে হাড়, মাংস, মল, মূত্র প্রভৃতি ছড়িয়ে আছে এবং তা থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ বার হচ্ছে, সেইরকম নোংরা জায়গা হলেও তিনি বলেছিলেন যে তিনি সেখানেই থাকবেন, কেননা তিনি থাকলে ওইসব লোক সুখ লাভ করবে। তাৎপর্য হল, যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁরা নিজেদের সুখ দেখেন না। নিজেদের সুখ তো পশুরাও দেখে। শূকর, কুকুর, উট, গাধাও নিজেদের সুখ দেখে। মানুষও যদি তাই দেখে তাহলে আর মানুষ কেন হল ?

ভগবান মানুষকে সেবা করার অধিকার দিয়েছেন। অতএব কায়মনোবাক্যে অন্যের সেবা করুন। নিজেদের কাছে যা আছে তাই দিয়ে সেবা করুন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে রাস্তা দেখিয়ে দিন। প্রেমের সঙ্গে উত্তর দিন। জল পান করান। আমাদের সকলকে সুখ দিতে হবে। আপনাদের হৃদয়ে যদি সকলকে সুখ দেওয়ার ভাব থাকে তাহলে পরিচিত-অপরিচিত সকলেই প্রসন্ন হবে। আপনার দর্শনেই দুনিয়া শান্তি পাবে। কত বড় কথা ! কিছু যদি করতে নাও পারেন তাহলেও বসে বসে চিন্তা করুন যে সকলে সুখী কী করে হবেন ? সকলে ভগবানের

[1]গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় জয়দয়াল গোয়েন্দকা।

ভক্ত কী করে হবেন ? ভগবানকে বলুন, হে প্রভু ! সকলে যে আপনার ভক্ত হয়ে যায়, সকলে যেন আপনার ভজনা করে, সক যেন সৎসঙ্গে যুক্ত হয়, সৎশাস্ত্রে সকলে যেন নিমগ্ন হয়। ভালো ভা বই থেকে অনেক লাভ হয়। আমি বই থেকে অনেক কিছু লাভ করে এবং এখনও করছি। আপনারাও দেখুন। আপনারাও পড়ুন। এটি হ প্রকৃত লাভ। অন্যকে ভালো বই পড়তে দিয়ে বলুন, একবার পড়ে দে দেখুন, বোধ হয় আপনার ভালোই লাগবে। পড়া হয়ে গেলে বই ফেরৎ নেবেন এবং অন্য বই দেবেন। এইভাবে ভালো বইয়ের প্রচা করুন, তাতে মানুষের ভাবের পরিবর্তন হবে। এর মতো আর কোনে সেবা নেই। এই সেবা দান-ধ্যানের চেয়েও শ্রেয়। অন্যকে সৎশাস্ত্রে ম করানো, ভজনে যুক্ত করা, সৎসঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া খুবই বড় সেবা বিনাব্যয়ে কল্যাণ হয়ে যায় ! কলকাতায় একজন লোক আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর মনিব তাঁকে প্রতি দিন সৎসঙ্গে যেতে বলতেন কিন্তু তাঁর ভালো লাগত না। যখন তাঁকে বারবার বলা হল তখ লোকটির মনে হল এত বার করে যখন বলছেন, একবার যাওয়া যাক্। তিনি সৎসঙ্গে গেলেন। এই মনে করেই গেলেন যে, ধনী মনি বার বার করে বলছেন, সৎসঙ্গে যাওয়াই যাক্। তিনি সৎসঙ্গে গেলেন মন বসে গেল এবং তিনি সেখানে রোজ যেতে আরম্ভ করলেন এইভাবেই সকলকে ভালোবেসে, প্রীতিপূর্বক সৎসঙ্গে জুড়ে দিন মনের মধ্যে এই ভাব রাখুন যে সকলের যেন কল্যাণ হয়। সকলের যে উদ্ধার হয়। সকলে যেন মুক্তি লাভ করে।

যারা পাপী, অন্যায়কারী, খারাপ রাস্তায় যারা চলে তারাও য চোখে পড়ে তাহলে এটি মনে করতে হবে যে এরা সবাই ভগবানে প্রিয়। ভগবান বলেছেন **'সব মম প্রিয়'**, একথা বলেননি 'ভক্তর আমার প্রিয়' ! তিনি সকল জীবকেই নিজের প্রিয় বলেছেন। সুতরা

যারা পাপ, অন্যায় করে তারাও ভগবানের প্রিয়, তবে ভগবানের আদরে উচ্ছন্নে গিয়েছে। বেশি আদরে ছেলেরা বিগড়ে যায়। এইজন্য তাদের প্রতি দয়া করুন এবং তাদের ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করুন। ভগবানমুখী করুন। কেউ যদি অসুস্থ হয় কিন্তু তাকে সুস্থ করার যোগ্যতা যদি আপনাদের না থাকে তাকে সেইখানে নিয়ে যান যেখানে বিনাব্যয়ে ঔষধ পাওয়া যায়। তেমনই, যারা পাপকাজে যুক্ত, তাদের ভালো ভালো কথা শোনান, তাদের বই দিন। তা করতে না পারলে তাদের সৎসঙ্গে নিয়ে যান। সৎসঙ্গ এক চিকিৎসালয়। সেখানে গেলে কোনো না কোনো ওষুধ কাজে লাগবেই।

কলকাতায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি একটি খুব ভালো কথা বলেছিলেন যে আমি ভগবানকে বলি 'হে প্রভু! আপনাকে তো সকলের পালন করতেই হবে, আমাকেও কখনো কখনো সুযোগ দিন, আমাকেও নিমিত্ত করে দিন। কাউকে অন্ন, কাউকে বস্ত্র, কাউকে সাহায্য করতে হবে, কাউকে আর কিছু দিতে হবে। করবেন আপনি, দেবেনও আপনি। কিন্তু সেইসঙ্গে আমাকেও একটু নিমিত্ত করে নিন।' এইভাবে আপনারাও ভগবানকে বলুন যে, হে নাথ । আপনি সকলেরই পালন-পোষণ করেন এবং সকলেই আপনার প্রিয়। আপনি আর একটু কৃপা করুন, আমাকেও কোথাও না কোথাও নিমিত্ত করে নিন। যেখানে যোগ্য মনে করবেন সেখানে লাগিয়ে দিন। কোনোভাবে আমিও লোকেদের হিতসাধনের নিমিত্ত হয়ে যাই। এইভাবে ভগবানকে বলুন এবং নিজেদের দিক থেকে এইভাব রাখুন যে সকলে ভগবানের ভক্ত হয়ে যায়। এখানে (হৃষীকেশ, গীতা ভবনে) এক সজ্জন ছিলেন। বটবৃক্ষের তলায় সৎসঙ্গ হচ্ছিল। ওইদিকে কেদার-বদ্রী যাবার যে রাস্তা সেখান দিয়ে কয়েকজন লোক যাচ্ছিলেন। তাঁদের দেখে সেই সজ্জন বললেন যে

আমার মনে হল ওই দিক দিয়ে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা যদি এই দিকে হয়ে যান তাহলে কিছুটা সৎসঙ্গ লাভ করতে পারেন। এই মনোভাব তৈরিতে কি কিছু পয়সা খরচ হয় ? ভগবান বলেন—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (গীতা ১২।৪)। 'যাঁরা সকল প্রাণীর হিতকর্মে রত তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন।' সকল প্রাণীর হিতকর্মের ভাব হল ভজন। ভজন খুবই জরুরি কাজ, মোটেই সাধারণ নয়। অসুস্থ হলেও শুয়ে শুয়ে এইভাব রাখুন যে সকলে যেন ভগবানের ভক্ত হয়ে যায়। হে নাথ ! সকলে যেন আপনার দর্শনে রত থাকে, আপনার প্রেমে যুক্ত হয়, আপনার ভজনায় নিরত হয়। কত বড় কথা ! তারা ভজনা করুন বা না করুন তাতে আপনার কী দায় ? ভজনা না করা তাদের মর্জি ! আমরা বললাম, সৎসঙ্গে চলুন। তারা বলল, যাও যাও, আমরা যাব না। আচ্ছা বাবা ঠিক আছে।

মুঁড়বাতে (রাজস্থানে) একজন সজ্জন ছিলেন। তিনি লোকেদের সৎসঙ্গে যেতে বলতেন। লোকেরা বলত, সময় নেই। দ্বিতীয় দিন আবার সৎসঙ্গে যেতে বললে লোকেরা আবার বলত সময় নেই। তৃতীয় দিন আবার সেই কথা বলাতে লোকেরা তাড়না করত। কিন্তু তিনি পরোয়াই করতেন না। এখন ঠাকুর যদি তাঁর উপর প্রসন্ন না হন তাহলে কার উপর প্রসন্ন হবেন ? কারো কাছ থেকে কিছু নেওয়ার নেই, কোনো স্বার্থের সম্বন্ধ নেই তাহলেও মনের ইচ্ছা লোকেরা সৎসঙ্গে যাক, ভজনা করুক, ভগবানের সম্মুখীন হোক। এমন ভাব তৈরি করতে আপনাদের কি কোনো খরচ হয় ? একটি প্রবাদ আছে— **'হীংগ লগে ন ফিটকড়ী, রংগ ঝকাঝক আয়ে।'** আধ্যাত্মিক উন্নতি করার এই সহজ উপায় কেউ কেউ পায়। এটি এমনই সুন্দর বিদ্যা।

শ্রোতা—আপনি এখনই ভগবানের কাছে কিছু সেবা করার সুযোগ দেবার জন্য প্রার্থনা করতে বললেন। ভগবানের কাছে এই কথা বল

ভালো, নাকি সেবাদানকারী সংস্থায় গিয়ে একথা বলা ভালো ?

স্বামীজী—দুটিই করুন। আমরা ভিক্ষা করতে গেলে মা-বোনেরা জিজ্ঞাসা করেন মহারাজ ! রুটি আনব, না খিচুড়ি ? আমরা বলি রুটির উপর খিচুড়ি দিন। আমাদের তো লাভের কথা ভাবতে হবে। একজন পণ্ডিতকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি এখানে বসে খাবেন, নাকি খাবার নিয়ে যাবেন ? তিনি বললেন, বসে খাব, আবার রান্নার সামগ্রীও (আটা প্রভৃতি) নিয়ে যাব এবং যজমানকে খুশিও করব। আপনারাও তাই করুন। নিজেরাও করুন, অন্যদেরও নিযুক্ত করুন। যেমন ধনী ব্যক্তির নানা দিক থেকে আমদানি হয়, চার দিক থেকে ধন আসে ; তেমনিই আপনারাও যদি শুদ্ধ হৃদয়ে লেগে পড়েন, তাহলে চারদিক থেকে লাভ হবে।

শ্রোতা—যখন সকলেই ভগবানের প্রিয় তাহলে জগৎ সংসারে কেন অন্যায় হচ্ছে ?

স্বামীজী—অন্যায় হয় না, অন্যায় করা হয়। অন্যায়কারী যাকে কষ্ট দেয় সেটি ওর পাপের ফল। যে ভোগ করে সে শুদ্ধ হচ্ছে। অতএব তার উপর অন্যায় করা হচ্ছে না, বরং যে তা করে তারই অন্যায় হয়। আমি আগেই বলেছি যে ভগবানের দৃষ্টিতে কুপুত্র-সুপুত্র সব রকমের হয়। কিন্তু যাকে দুঃখ দেওয়া হয়, তার খারাপ হয় না, বরং তার ভালোই হয়। নিজের পাপের ফল ভোগ করে সে শুদ্ধ, পবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং কেউ যদি বলে যে তার উপর অন্যায় করা হচ্ছে তা একেবারেই মিথ্যা কথা। অন্যায় হয়ই না। যখন ভগবান রয়েছেন তখন ভগবানের রাজ্যে কি অন্যায় হতে পারে ? হতে পারে না।

বালিয়ায় এক সজ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি খ্রিস্টকে খুব মান্য করতেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, খিস্ট্রধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ যে কথা আপনি আমাকে বলবেন তার চেয়েও বড় কথা আমি সনাতনধর্ম

থেকে বলে দেব। তিনি বলেছিলেন, যীশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল তখন তিনি প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করেছিলেন, হে প্রভু। এদের সুবুদ্ধি দিন। গুজরাটিতে ভক্ত-চরিত্র সম্পর্কে একটি বই আছে। তাতে লেখা আছে, কয়েকজন চোর চুরি করে পালিয়ে যায়। পুলিশ জানতে পেরে তাদের তাড়া করে। চোরেরা যখন দেখল যে পুলিশ আসছে তখন তারা একটি জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। সেখানে একজন সাধু চোখ বুজে ভজনা করছিলেন। চোরেরা লুটের মাল সেই সাধুটির কাছে রেখে পালিয়ে যায়। পুলিশ সেখানে এল, চোরাই মাল পড়ে থাকতে দেখে ভাবল, এই লোকটি চুরি করে এখন সাধু সেজেছে! তারা সাধুকে মারতে লাগল। তখন সাধু একথা বলেননি যে 'এদের সুবুদ্ধি দাও।' তিনি বলেছিলেন—'**বধুঁ তূ জানে ছে**' অর্থাৎ হে প্রভু সব কিছু আপনিই জানেন। এখন আমি কোনো দোষ করিনি। বসে বসে ভজনা করছি। তাহলে মার যখন খেতে হচ্ছে তখন আগে নিশ্চয় আমি কোনো পাপ করেছি, যা আমি জানি না, আমার মনে নেই। এইভাবে সাধু তাদের দুর্বুদ্ধি বলে মনে করেননি। বরং এটিকে ভগবানের বিধান বলেই মনে করেছিলেন।

মন-বুদ্ধি নিজের নয়

নিজের স্বরূপে স্থিত হবার কথা যেখানে আসে সেখানে আমরা সেই মন ও বুদ্ধি দ্বারাই স্বরূপে স্থিত হতে চাই যাতে সংসারের সংস্কার যুক্ত হয়ে আছে। মন এবং বুদ্ধি সংসারের দিকেই দৌড়াতে থাকে। আমাদের কাছে মন ও বুদ্ধি নিযুক্ত করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এই অবস্থায় আমরা মন এবং বুদ্ধি থেকে কী করে ভিন্ন হব ?

আমরা মন ও বুদ্ধিকে পরমাত্মার দিকে নিয়ে যেতে চাই কিন্তু তারা সংসারের দিকেই ধাবিত হয়। এতে প্রধান কথা হল আমাদের অন্তরে সংসারের গুরুত্বই বেশি। অন্তঃকরণে উৎপত্তি-বিনাশশীলের প্রতি যে গুরুত্ব অবস্থিত তাকেই আমরা বেশি যত্ন করেছি—এইটিই হয়েছে বাধা। চিন্তনের দ্বারা এই বাধাকে দূর করে দিলে তা হবে **'জ্ঞানযোগ'**। এই জট ছাড়াবার জন্য ভগবানের শরণ নিয়ে যদি তাঁকে ডাকেন তাহলে তা হবে **'ভক্তিযোগ'**। নিজের কাছে যতসব সামগ্রী আছে সেগুলিকে ব্যক্তিগত মনে না করে অপরের কল্যাণের জন্য ব্যায় করলে তবে তা হবে **'কর্মযোগ'**। এই তিনটির মধ্যে যেটিকে আপনারা সহজ মনে করবেন তা শুরু করে দিন।

বস্তুসামগ্রীকে মানুষের সেবায় লাগান। সমাধিকেও সেবায় লাগিয়ে দিন। নিজের শরীর, মন, বুদ্ধিকে সেবায় লাগিয়ে দিন। কেবল অপরকে সুখ প্রদান করতে হবে এবং নিজেকে হতে হবে সম্পূর্ণ কামনাহীন। জড় বস্তুর প্রতি কোনো রকম কামনা থাকলে বন্ধন থাকবে, এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এই কথা মনে ভালোভাবে গেঁথে যাওয়া উচিত যে সংসারের কোনো কিছুতে যদি কামনা থাকে তাহলে দুঃখ এবং বন্ধন থেকে বাঁচা যাবে না। কেননা অন্য কিছুর কামনা থাকলে, অন্যের কাছ থেকে সুখ পাবার ইচ্ছা থাকলে পরাধীন হতেই

হবে এবং **'পরাধীন সপনেহুঁ সুখু নাহীঁ'** (রামচরিতমানস ১।১০২।৩)। কোনো কিছুর কামনা যদি না থাকে তাহলে দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

বুদ্ধি যদি সংসারের দিকে যেতে চায় তো যেতে দিন। বুদ্ধি আপনার, না আপনি বুদ্ধির ? নিজে চিন্তা করুন, শোনা কথায় কান দেবেন না ? আপনাদের বুদ্ধি যদি সংসারের দিকে যায় তাহলে বুদ্ধিতে মমত্ব করবেন না। বুদ্ধি তো আপনাদের বৃত্তি। বুদ্ধিকে যদি নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী নিযুক্ত করতে নাও পারেন তাহলে তার প্রতি বিমুখ হয়ে যান। মনে করুন যে আপনারা হলেন বুদ্ধির দ্রষ্টা, বুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা ও আমরা হলাম বুদ্ধির জ্ঞাতা। বুদ্ধি হল করণ এবং পরমাত্মতত্ত্ব করণ-নিরপেক্ষ। লেখাপড়া করার সময়েও আমার মনে এই জিজ্ঞাসা ছিল যে কী করে জীবের কল্যাণ হবে ! এই কথা যখন আমি জানতে পারলাম যে পরমাত্মতত্ত্ব করণ-নিরপেক্ষ তখন আমার খুব লাভ হল, আমি প্রসন্ন হলাম। খুবই ভালো হবে যদি আপনারা প্রথম থেকেই এই কথায় মন দেন। তত্ত্ব বৃত্তির অন্তর্গত হবে না। যা প্রকৃতির অতীত তাকে প্রকৃতি-বৃত্তি দিয়ে কী করে ধরবেন ? অতএব এই কথাটি পাকা করে নিন যে তত্ত্ব-প্রাপ্তি করণ-নিরপেক্ষ, করণ-সাপেক্ষ নয়। করণ-নিরপেক্ষকে আমরা কেমন করে মেনে নেব ? করণের প্রতি আপনারা নিশ্চুপ হয়ে যান। করণকে ভাল মনে করবেন না, মন্দও মনে করবেন না। করণকে যদি কর্তা বলে গ্রহণ না করেন তাহলে কর্তা করণ থেকে স্বতই আলাদা থেকে যাবে। করণকে নিজের থেকে ভিন্ন অনুভব করে চুপ হয়ে যান। পারলে এক সেকেন্ড বা দু সেকেন্ড চুপ করে থাকুন, কোনো কিছুই চিন্তা করবেন না—**'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'** (গীতা ৬।২৫)। কোনো কিছুই চিন্তা না করলে আপনাদের স্থিতি স্বরূপেই থাকবে। এটি খুবই বড় সাধনা।

আমরা কিছু চিন্তা না করলেও চিন্তা এসে যায়, তাহলে কী করব ? এই বিষয়ে একটি কথায় খুব মন দেওয়া দরকার। তা হল যখনই কোনো চিন্তা এসে যায় তখন সাধক তাকে সরাতে চান। যাঁরা সাধনা করেন তাঁদের প্রায়শই এই চেষ্টা থাকে যে, অন্য কথা মনে এসে গেলেও তাকে সরিয়ে দিয়ে মনকে পরমেশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া। এই চেষ্টার দ্বারা তাড়াতাড়ি সিদ্ধি হয় না, সাধক তাড়াতাড়ি সফল হন না। সফলতার চাবি-কাঠি হল চিন্তাকে উপেক্ষা করা। উঁচু বা নিচু যে বৃত্তিই আসুক তাকে গুরুত্ব দেবেন না। বৃত্তিকে সরাতেও হবে না, লাগাতেও হবে না। সরালেও বৃত্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, আবার লাগালেও তাই হবে। বৃত্তিকে গুরুত্ব দিলে জড়ত্বের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে, স্বরূপের গুরুত্ব থাকবে না। এটি মার্মিক কথা। আপনাদের মন যাতে এদিকে আকৃষ্ট হয় তাই বলছি যে এইকথা আমার খুব প্রিয়, খুব উত্তম মনে হয়েছে। এতে খুবই লাভ হয়।

মন এবং বুদ্ধিকে উপেক্ষা করুন। তাতে ভালো-মন্দ যাই আসুক, কিছু ভাববেন না। যার চিন্তাই আসুক তাকে উপেক্ষা করুন। তার সঙ্গে বিরোধ করবেন না, তাকে সরাবেনও না, ধরবেনও না। এই উপেক্ষা করাটা যদি কুক্ষিগত হয়ে যায় তাহলে খুবই লাভ হবে। চিন্তার প্রতি উদাসীন হয়ে যান। তাকে ভালোও ভাববেন না, খারাপও ভাববেন না। ভালো ভাবলে তার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে যাবে আবার খারাপ ভাবলেও তাই হবে, ভগবানকে যাঁরা ভালোবেসেছেন তাঁদের উদ্ধার হয়েছে, যাঁরা শত্রুতা করেছেন তাঁদেরও উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু যাঁরা কিছুই করেননি তাঁদের উদ্ধার হয়নি। সুতরাং সংসারকে ভালবাসলেও ফাঁসবেন, শত্রুতা করলেও ফাঁসবেন। কেননা সংসারের প্রতি প্রীতি বা শত্রুতা করলে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ এসে যাবে। সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করাই হল জ্ঞানযোগের প্রধান কথা।

বিবেক সৎ-অসৎকে নির্ধারণ করে, অতএব বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে অসৎ-কে উপেক্ষা করুন। বৃত্তিগুলির সৃষ্টি হয় এবং নাশ হয়। এইজন্য এগুলি হল অ-সৎ। যার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, যার আরম্ভ এবং অন্ত হয় তা হল অ-সৎ। যা অ-সৎ তা নিজে থেকেই দূর হয়ে যায়। সেজন্য তা দূর করার চেষ্টা একেবারেই নিরর্থক। যা সৃষ্ট হয়েছে তার প্রধান কাজই হল নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, তার অপরিহার্য কাজটা কী ? তা হল মৃত্যু। সে বড় হবে কিনা, তার বিবাহ হবে কিনা, তার ছেলে মেয়ে হবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, কিন্তু সে মরবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই তার প্রধান কাজই হল মারা যাওয়া। অনুরূপভাবে বৃত্তি যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তারও প্রধান কাজ হবে নষ্ট হয়ে যাওয়া। তাই একে নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করা, শক্তি প্রয়োগ করা, বুদ্ধি লাগানো, সময় ব্যয় করা একেবারেই মূর্খতা আর তাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করাও মূর্খতা। যা থাকবে না তাকে রাখবার ইচ্ছা করাই তো এক বড় দুঃখ। কিন্তু আমাদের ভায়েরা সচেতন হন না। কী করা যাবে ? রাখবার ইচ্ছাও করবেন না, দূর করবার ইচ্ছাও করবেন না। কিন্তু নিজেদের কর্তব্য পালন করতে হবে যাতে সকলের সুখ হয়, আরাম হয়। যা নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে, থাকবে না তাকে উপেক্ষা করুন—**'দেখো নিরপখ হোয় তমাশা'**। এটি খুবই লাভদায়ক। অতএব বুদ্ধির প্রতি কোনো আগ্রহ না রেখে তার প্রতি উদাসীন হয়ে যান। উদাসীন হওয়া যায় না একথা মনে করবেন না। এখন এমন মনে হয় যে আমরা এ থেকে আলাদা হতে পারব না। কিন্তু তা নয়। এইজন্যই এই কথা বলেছি যে আপনারা বুদ্ধির, না বুদ্ধি আপনাদের। এটি সাধারণ কথা নয়। এটি খুবই কাজের কথা। আমরা বুদ্ধির নই, বুদ্ধিই আমাদের। তাই একে আমরা কাজে লাগাতেও পারি, নাও লাগাতে পারি। কিন্তু আমরা যদি বুদ্ধির হতাম তাহলে গোলমাল

হয়ে যেত।

মনোবৃত্তিকে উপেক্ষা করলে আপনাদের স্বরূপে স্থিতি স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করতে যথেষ্ট অভ্যাস করতে হবে। বৃত্তিকে উপেক্ষা করতে অভ্যাসের প্রয়োজন নেই। গীতার যোগ কী ? **'সমত্বং যোগ উচ্চতে'** (২।৪৮)। 'সম' নাম পরমাত্মার। পরমাত্মাতে স্থিত হওয়া হল গীতার যোগ আর চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করা হল যোগদর্শনের যোগ। আপনারা বলেন যে মন থামে না। কিন্তু মনকে থামাবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হল পরমাত্মাতে স্থিত হওয়া। যেমনই আপনারা অন্তর-বাহিরে চুপ করে যান তখনই আপনারা পরমাত্মাতে থাকেন এবং পরমাত্মাতেই থাকবেন। কেননা কোনো ক্রিয়া, বৃত্তি, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি পরমাত্মাকে ছেড়ে হতে পারে কি ? বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ, ঘটনা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করলে পরমাত্মাতেই স্থিতি হবে। হ্যাঁ, এতে নিদ্রা, আলস্য থাকা উচিত নয়। ঘুমেতে অজ্ঞানে (অবিদ্যায়) ডুবে থাকেন। ঘুম ভেঙে গেলে বলেন 'আমার কিছু জানা নেই।' কিন্তু আপনারা তো সে সময় ছিলেন। অতএব নিদ্রা-আলস্য যেন না হয়। চলতে ফিরতে আপনারা চুপ করে যান, কোনো কিছুই চিন্তা করবেন না। এটি গীতার যোগ। এতে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধি লাভ হবে। যোগদর্শনের যোগে অনেক সময় লাগবে। আপনারা যদি পরমাত্মাতে বৃত্তি নিয়োজিত করেন তাহলে বৃত্তি আপনাদের সঙ্গ ছাড়বে না, আপনাদের সঙ্গে লেগে থাকবে। এইজন্য মন-বুদ্ধিকে উপেক্ষা করুন। তাদের সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যান। এখনই লাভ কিছু হল কিনা তা দেখতে যাবেন না। তাকে উপেক্ষাই করুন। ওষুধ খান, তার ফল পাবেনই।

আপনারা খেয়াল করবেন। বুদ্ধি হল করণ আর নিজেরা হলেন কর্তা। বুদ্ধি আমার, আমি বুদ্ধির নই। এই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ খুবই কাজের।

আপনারা মোটেই বুদ্ধির নন। কুকুর চিন্তা করলে তার প্রভাব আপনাদের উপর কী পড়বে ? কুকুরের বুদ্ধির সঙ্গে নিজেদের যে সম্বন্ধ, নিজেদের বুদ্ধির সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ। আপনাদের আত্মা যখন সর্বব্যাপী তখন তা কুকুরের মধ্যেও আছে। তাহলে আপনারা কুকুরের মন-বুদ্ধির চিন্তা কেন করেন না ? তা এইজন্য যে কুকুরের মন-বুদ্ধিকে আপনারা নিজেদের বলে মনে করেন না। তাৎপর্য হল এই যে, মন-বুদ্ধিকে আপন মনে করাই ভুল।

যা আলাদা তা প্রথম থেকেই আলাদা। সূর্যকে তার প্রকাশ থেকে কেউ কি আলাদা করতে পারে ? আপনারা যদি শরীর থেকে ভিন্ন হয়ে থাকেন তাহলে প্রথম থেকেই তা হয়ে আছেন। আপনারা মিথ্যাই নিজেদের শরীরের সঙ্গে জড়িত মনে করেন। শরীরের মধ্যে আপনারা নেই আর শরীরও আপনাদের মধ্যে নেই। অহংবোধ এবং মমত্ব থেকে নিবৃত্ত হলে শান্তি স্বতঃসিদ্ধ—**'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি'** (গীতা ২।৭১)।

সৎস্বরূপের অনুভূতি

কোনো বস্তু নির্মাণ (তৈরি) করা হয়, আবার কোনো কিছু অন্বেষণ করা (খোঁজা) হয়। খুঁজলে সেই জিনিসই পাওয়া যায় যা আগে থেকেই ছিল। যে জিনিস তৈরি করা হয়, তা আগে ছিল না, তৈরি করার পরই তা হয়েছে। পরমাত্মতত্ত্ব সৃষ্টি করা যায় না। তা কৃতিসাধ্য নয়। যা কৃতিসাধ্য নয় তাতে কর্তা, কর্ম, করণ প্রভৃতি কোনো কারক প্রযুক্ত হয় না। করা সবই প্রকৃতিতে হয়ে থাকে—**'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'** (গীতা ৩।২৮), **'নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারম্'** **(গীতা ১৪।১৯)**, **'ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে'** (গীতা ৫।৯) **'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ'** (গীতা ৩।২৭)। প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব তাতে ক্রিয়া হয় না, কখনো হয়নি, কখনো হবে না, কখনো হতে পারে না। সেই পরমাত্মতত্ত্ব যেমনকার তেমনই আছে। 'নাস্তি'-র প্রতি যে আকর্ষণ সেটি ছাড়া তাঁর প্রাপ্তিতে অন্য কোনো বাধা নেই। আপনারাই 'নাস্তি'-কে সত্তা দিয়েছেন। তার নিজস্ব কোনো সত্তাই নেই। নিজের শিশুকাল কি আপনারা ত্যাগ করেছেন ? কেউ যদি ত্যাগ করে থাকেন তাহলে বলুন যে কোন্ তারিখে ত্যাগ করেছেন ? শিশুকাল তো নিজে থেকেই চলে গিয়েছে। যা অ-সৎ, মুহূর্তের জন্যও তা টিকে থাকতে পারে না। এর পরিবর্তনের গতি এতই দ্রুত যে একে আপনি দ্বিতীয়বার দেখতে পারেন না। প্রথমে যেমন দেখেছেন, দ্বিতীয়বার দেখলে আর তেমনটি দেখা যাবে না, দেখবেন বদলে গিয়েছে। এই কথাটি আপনার বোধগম্য হল কিনা সেটি আলাদা কথা।

এক বছরে যার বদল হয়, তা এক মাসেও বদলায়, প্রতিদিন বদলায়, প্রতি ঘন্টায়, প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেন্ডে বদল হতে থাকে। পরিবর্তন ছাড়া সংসারের আর কোনো তত্ত্বই নেই—**'সম্যক্ প্রকারেণ সরতি ইতি সংসারঃ'**, **'গচ্ছতি ইতি জগৎ'** যা সর্বদাই বদলায় তাকে আপনারা স্থায়ী মনে করেন আর যা কখনো বদলায় না, কখনো বদলাবে না, কখনো বদলাতে পারে না তার প্রাপ্তিকে কঠিন মনে করেন। যা নিরন্তর

থাকে, কখনো বদলায় না তার প্রাপ্তিকে কঠিন মনে করলে সুগম কোন্‌টি ? এটি তো স্বতঃস্বাভাবিক, কেবল এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

আপনারা চিন্তা করে দেখুন, এই যে 'সংসার বিদ্যমান' বলে মনে হয় এই 'বিদ্যমানতা' কি সংসারে রয়েছে ? যদি সংসারের 'বিদ্যমানতা' থাকে তাহলে সংসার বদলায় কেন ? যা সৎ তা তো অবিদ্যমান হয় না। অথচ সংসারের 'অবিদ্যমানতা' প্রত্যক্ষ হয়। অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা, দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, সব কিছুর পরিবর্তন হয়, এ আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। স্থূলভাবে বললে, বলা যায়, আপনারা যখন এখানে আসেননি তখন (সূর্যের) আলো যেমন ছিল, আপনারা আসার পরেও তেমনই আছে। আপনারা এলেন এবং চলে গেলেন তাতে আলোর কি কোনোরকম তারতম্য হচ্ছে ? এই রকমই আপনারা কখনো গরিব হলেন বা বড়লোক হলেন, কখনো অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কখনো-বা সুস্থ, কখনো সম্মানিত হলেন কখনো বা অপমানিত তাতে আপনাদের অস্তিত্বে, আপনাদের সত্ত্বায় কি কোনো পরিবর্তন হয় ? আপনাদের যে অস্তিত্ব, যা সত্তা-স্বরূপ তাতেই আপনারা স্থিত আছেন '**সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ**' (গীতা ১৪।২৪)। তাৎপর্য হল আপনাদের সত্তা চিরকাল থাকবে। যদি আপনাদের সত্তা না থাকে তাহলে চুরাশি লক্ষ যোনি কে ভোগ করবে, নরক কে ভোগ করবে, স্বর্গ প্রভৃতি লোকে কে যাবে ? আপনাদের সত্তা চিরকাল যেমনকার তেমনই থাকে। তাতে কোনো পরিবর্তন হয়নি, হবে না, হতে পারে না।

চিন্তা করুন, আপনাদের অস্তিত্বে কোন্ করণের সহায়তা রয়েছে ? কোন্ কারকের সহায়তা আপনাদের অস্তিত্বে ? আপনাদের অস্তিত্ব করণ-নিরপেক্ষ। স্ব-সত্তায় স্থিত থাকা সত্ত্বেও আপনারা যা নেই, যার বাস্তবিক সত্তা নেই তাতে জড়িয়ে যান। বাস্তবে তাতে কখনোই জড়িত হতে পারেন না। অ-সৎ-এর সঙ্গে জুড়ে যাবেন, অ-সৎ-এর সঙ্গে থাকবেন এমন শক্তি কারো নেই। থাকবেন কী করে ? অসৎ তো পরিবর্তনশীল। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যই পরিশ্রম করা হয়। মিথ্যা

বাজে পরিশ্রম করা হয়। নিজের অস্তিত্বে কী তফাৎ হয় ? ক্রিয়াগুলি এবং পদার্থের পরিবর্তনকে নিজস্ব বলে মনে করা হল আপনাদের স্বকীয়, অস্তিত্বে কোনো পরিবর্তন হয় না। যাওয়া-আসার মধ্যে পরিবর্তন আছে। প্রকাশে কোনো পরিবর্তন নেই। এরূপই যা সবকিছুর প্রকাশক, স্বয়ংপ্রকাশ, প্রকাশস্বরূপ তাতে কখনো পরিবর্তন হয় না। যা অস্তি তা নাস্তি হতে পারে না এবং যা নেই তা কখনো অস্তি হতে পারে না—**'নাসতে বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।'** (গীতা ২।১৬)। অ-সৎ-এর সত্তা হয় না এবং সৎ অবিদ্যমান হয় না। সৎ সর্বদা যেমনকার তেমন, অটল, অখণ্ড থাকে এবং তাতে সব কিছুর স্থিতি স্বতই থাকে। কিন্তু যা চলে যায় তাকেই আপনারা স্থিত বলে মেনে নেন—আমি ধনী, আমি রুগী, আমি নিরোগ, আমার সম্মান, আমার অসম্মান। যা চলে যায় তাকে আপনারা ধরে রাখতে পারবেন না, যুগ-যুগান্তর ধরে পরিশ্রম করলেও পারবেন না। নিজের স্বতঃসিদ্ধ সত্তায় স্থিত হয়ে যান। তাহলে গুণাতীতের সকল লক্ষণ আপনাদের মধ্যে এসে যাবে। বাস্তবে এই সমস্ত লক্ষণ (গুণ) আপনাদের মধ্যে স্বতই রয়েছে কিন্তু যা পরিবর্তনশীল তার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় সেগুলির অনুভূতি হচ্ছে না।

শ্রোতা—ক্রিয়াগুলির মধ্যেও তো সেই সত্তা রয়েছে।

স্বামীজী—ক্রিয়াগুলির সত্তাই নেই। ক্রিয়া তো আরম্ভ হয় এবং শেষ হয়। আমি বক্তৃতা শুরু করেছিলাম, এবার শেষ হচ্ছে। ক্রিয়া এবং পদার্থ সব বিনাশশীল।

শ্রোতা—সত্তা ছাড়া ক্রিয়া কী করে হল ? সত্তা আছে বলেই না ক্রিয়া হল ?

স্বামীজী—ঠিকই তো, মূলে সত্তা রয়েছে, ক্রিয়া কোথায় ? আমিও তো এই কথাই বলি। ক্রিয়ার অবিদ্যমানতা হয়। সত্তার কখনো অবিদ্যমানতা হয় না। একেবারে খাঁটি কথা। এটিকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না। কারও ক্ষমতা নেই একথার খণ্ডন করার। অ-সতের সত্তাও

সতের অধীন আবার সৎ-এর সত্তাও সতের অধীন। অ-সৎ-এর স্বতন্ত্র-সত্তা কখনো হয়নি, কখনো হবে না, কখনো হতে পারে না। এইজন্য নিজের সত্তায় স্থিত থাকুন, এদিক-ওদিক হবেন না। **'সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ'** সুখ-দুঃখ তো আসে-যায়। এতে আপনারা স্বতই সম রয়েছেন, তা যদি না থাকতেন তাহলে এই দুটির জ্ঞান আপনাদের হত কী করে ? সুখ এলে আপনারা তার সঙ্গে মিশে সুখী হয়ে যান এবং দুঃখ এলে তার সঙ্গে মিশে দুঃখী হন। আপনারা যদি সুখের সঙ্গে মিশে যেতেন তাহলে দুঃখ এলে আর তার সঙ্গে মিলতে পারতেন না। আর যদি দুঃখের সঙ্গে মিশে যেতেন তাহলে সুখ এলে আর তার সঙ্গে মিলতে পারতেন না। অতএব বাস্তবে আপনারা সুখ-দুঃখ থেকে ভিন্ন, কিন্তু ভুলক্রমে আপনারা নিজেদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশ্রিত মনে করে সুখী-দুঃখী হয়ে যান। সুখ এবং দুঃখ তো পরিবর্তনশীল, কিন্তু আপনারা পরিবর্তনশীল নন। আপনাদের কাছে কখনো সুখ আসে, কখনো দুঃখ, কখনো মান আসে, কখনো অপমান, কখনো শ্রদ্ধা, কখনো অশ্রদ্ধা, কখনো বিদ্যাবত্তা, কখনো মূর্খতা, কখনো রোগ, কখনো নিরোগত্ব, কিন্তু আপনারা যেমনকার তেমনই থাকেন। আপনারা যদি একইরূপে না থাকতেন তাহলে আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি কী করে হত ? যখন ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি হয় তখন আর আপনারা অবিদ্যমান হলেন কী করে ? সুখ-দুঃখ প্রভৃতির অবিদ্যমানতা হল। অতএব আপনারা এইটুকু কৃপা করুন যে নিজেদের বিদ্যমানতায় স্থিত থাকুন। আপনাদের বিদ্যমানতা স্বতঃসিদ্ধ, কৃতিসাধ্য নয়। সেদিকে খেয়াল করা হয়নি। মূল কথা এটিই।

শ্রোতা—মহারাজ, অন্তরে রাগ-দ্বেষ বজায় রেখেই ক্রিয়া হয়ে থাকে !

স্বামীজী—রাগ-দ্বেষ বজায় রেখেই ক্রিয়া করা হয়ে থাকে, কিন্তু আপনারা কি কখনো অবিদ্যমান হন ? যতই রাগ-দ্বেষ হোক, হর্ষ শোক হোক আপনাদের মধ্যে (স্বয়ং-এ) কি কিছু তফাৎ হয় ?

শ্রোতা—তফাৎ না হলেও রাগ-দ্বেষ আছে বলে সাধকের মনে বিচলতা আসে।

স্বামীজী—আপনারা রাগ-দ্বেষকে ধরে নেন, বহমানকে ধরে নেন, তাই বিচলিত হন। অনুরাগ থাকে না, বিদ্বেষ থাকে না, শত্রুতা থাকে না, সুখ থাকে না, দুঃখ থাকে না, যা থাকে না তাকে ধরে রাখেন, তাকে ধরবেন না। আপনারা তো যেমনকার তেমনই থাকেন। আপনারা যদি তেমন একইরূপ না থাকতেন তাহলে সুখ এবং দুঃখকে, অনুরাগ এবং বিদ্বেষকে আলাদা আলাদা করে কীকরে মানতেন? অনুরাগের সময় যেমন থাকেন, বিচ্ছেদের সময়ও তেমন থাকেন, বিদ্বেষের সময়ে যেমন থাকেন অনুরাগের সময়েও তেমনই থাকেন—সেজন্যই দুটির অনুভূতি হয়। যার দুটি অনুভূতি হয় তার মধ্যে দুটি কোথায় ?

এই এক ভ্রম হয়েছে যে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে কর্তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারকগুলি ক্রিয়ার হয়ে থাকে। কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ—এইগুলি সব ক্রিয়ার, প্রকৃতির। এই প্রকৃতি যার দ্বারা প্রকাশিত হয় তা যেমনকার তেমনই থাকে। অতএব আপনারা রাগ-দ্বেষকে ভয় করবেন না। এই সবই শেষ হয়ে যাবে, আসবে-যাবে। অ-সৎ তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। অ-সৎকে টিকিয়ে রাখবে এবং সৎকে বিনষ্ট করবে এমন শক্তি কারো নেই। অ-সৎ টিকে থাকতে পারে না এবং সৎ বিনষ্ট হতে পারে না। অ-সৎ-এ কারো স্থিতি হয়নি, হবে না, হতে পারে না এবং সৎ থেকে কেউ আলাদা হয়নি, হবে না, হতে পারে না।

শ্রোতা—অ-সৎ-এ স্থিত হয়েই তো ভোক্তা হয়ে থাকে ?

স্বামীজী—অবশ্যই, এতে কী বলার আছে ! সে অ-সতেই স্থিত বলে মেনে নেয়, কিন্তু বাস্তবে স্থিত হয় না। যদি আপনাদের স্থিতি সৎ-এ থাকে তাহলে অ-সতে স্থিতি কী করে হল ? আর অ-সতেই যদি হয় তাহলে সৎ-এ স্থিতি কী করে হবে ? বিদ্বেষে যদি স্থিতি থাকে তাহলে অনুরাগে কী করে স্থিতি হবে ? অনুরাগে যদি স্থিতি থাকে তাহলে দ্বেষে কী করে স্থিতি হবে ? অনুরাগ এবং বিদ্বেষ সংসারের বিষয়, তাতে

আপনারা লিপ্ত হয়ে যান। আপনাদের মধ্যে অনুরাগ, বিদ্বেষ, হর্ষ, শোক কিছুই নেই। এটি খুবই সহজ-সরল কথা। এতে কঠিনতার নাম-গন্ধ নেই।

শ্রোতা—তাহলে গোলমালটা কোথায় ?

স্বামীজী—অ-সৎকে আপনারা ত্যাগ করতে চান না, গোলমালটা এখানেই। আপনারা ধরে রেখেছেন যে সংসর্গের মধ্যেই সুখ, গোলমালটা এখানেই।

শ্রোতা—অ-সতের ত্যাগ কী করে হবে ?

স্বামীজী—আরে, অ-সৎকে আপনারা ধরতেই পারেন না। অ-সৎকে ধরে রাখবে এমন শক্তি কারো নেই। অ-সৎকে ত্যাগ করতে হবে না, তার ত্যাগ নিজে থেকেই হচ্ছে।

সুখ এবং দুঃখ, অনুরাগ এবং বিদ্বেষ—এই অনুভূতি যার হয়, তার সুখও হয় না, দুঃখও হয় না, অনুরাগ বা বিদ্বেষ হয় না, হর্ষ-শোক কিছুই হয় না। এই সবগুলি থেকে যে রহিত সেইটিই আপনার স্বরূপ। যার মধ্যে রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি হয় সেটি আপনার স্বরূপ নয়। সোজা কথা ! রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক প্রভৃতি যে দুটি জিনিস তা আপনাদের মধ্যে নেই। ওইগুলি তো আপনাদের সামনে দিয়ে অতিবাহিত হয়। কখনো অনুরাগ হল, কখনো দ্বেষ হল, কখনো আনন্দ হল, কখন-বা শোক, কখনো নিন্দা, কখনো-বা প্রশংসা হল। এগুলি আসে আবার চলে যায়। এই যে, যা হয় আবার চলে যায় সেগুলিকে নিয়ে আপনারা সুখী বা দুঃখী হন ! এগুলি তো আপনাদের সামনে আসে এবং চলে যায়। আপনারা যেমনকার তেমনই থেকে যান। আপনাদের মধ্য কোনো তফাৎ হয় না, আপনারা বদলান না। যা বদলায় না সেইটি হল আপনাদের স্বরূপ, আর যা বদলায় তা হল প্রকৃতির। এটুকুই বলা, লম্বা-চওড়া কোনো কথা নয়। আপনারা দয়া করে নিজেদের স্বরূপে স্থিত হন, স্বরূপে আপনাদের স্থিতি স্বত। আগন্তুক সুখে-দুঃখে, আগন্তুক রাগ-দ্বেষে আপনার নিজেদের স্থিতি জোর করে ধরে থাকেন।

তাতে আপনাদের স্থিতি কখনোই থাকবে না। আপনারা যতই চেষ্টা করুন না কেন অনুরাগ, বিদ্বেষ, সুখ, দুঃখ কোনটিতেই আপনারা আপনাদের স্থিতি রাখতে পারবেন না। তার কারণ আপনারা এগুলির সঙ্গে নেই এবং এগুলিও আপনাদের সঙ্গে নেই। আপনারা বলেন এগুলি দূর হয় না, আমি বলি এগুলি টেকে না।

শ্রোতা—এগুলিতে আমাদের স্থিতি বলে যে মেনে নিয়েছি সেই মান্যতা থেকে বেরিয়ে আসার সাধন কী ?

স্বামীজী—মেনে নেবেন না এইটিই হল সাধন। ভুলক্রমে যাকে মানা হয়েছে তাকে না মানাই হল সাধন। কত সহজ-সরল কথা ! কঠিনতার নাম-গন্ধ নেই। কিছু নির্মাণ করতে, তৈরি করতে কোথাও কঠিনতা হতে পারে, কোথাও তা সহজ হতে পারে। যা যেমনকার তেমনই বিদ্যমান তাঁকে জানায় কঠিনতা কোথায় !

শ্রোতা—রাগ-দ্বেষ যখন হয় তখন তো তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাই।

স্বামীজী—প্রভাবিত হওয়াটা আপনাদেরই ভুল। রাগ-দ্বেষের ভুল কোথায় হল ! আপনারা অনুরাগ এবং বিদ্বেষ দুটিকেই জানেন এবং দুটি থেকেই ভিন্ন। আপনারা ভিন্ন হয়েও প্রভাবিত হয়ে যান, মিলিত হয়ে যান, এই ভুলটি আপনারা করবেন না।

শ্রোতা—তার প্রভাব পড়ে।

স্বামীজী—আপনারা ওইগুলিকে গুরুত্ব দেন তাই প্রভাব পড়ে। গুরুত্ব দিলে তো প্রভাব পড়বেই। ওইগুলি তো আগন্তুক। গীতা পরিষ্কার বলেছে—**'আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব'** (২।১৪) 'এগুলি আসা-যাওয়া করে, এগুলি অনিত্য, এগুলিকে সহন করো, বিচলিত হয়ো না।' আপনারা মিথ্যাই বিচলিত হন, পাথর ওপরে ছুঁড়ে নীচে মাথা রাখেন। এতে অন্যের দোষ কোথায় ?

শ্রোতা—এই সহন করা কি অভ্যাসের দ্বারা অর্জিত হবে ?

স্বামীজী—আপনারা তো সহ্যই করেন, আর কী করেন, বলুন ?

সুখ এসে গেলে আপনারা কী করবেন ? দুঃখ এসে গেলে আপনারা কী করবেন ? বাধ্য হয়ে তো সহ্য করে থাকেন। জেনে-বুঝে করলে আপনারা মুক্ত হয়ে যাবেন, তা না হলে ভুগতে হবে। সহ্য না করে যাবেন কোথায় ? সুখ-দুঃখ যাই আসুক আপনারা যেমনকার তেমনই থাকেন।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ (গীতা ২।১৫)

'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! সুখ-দুঃখ সমভাব রক্ষাকারী যে ধীর মানুষকে এইসব মাত্রাস্পর্শ (পদার্থ) ব্যথা দেয় না, সে অমর হয়ে যায়।'

এইসব প্রাকৃত পদার্থ কাকে ব্যথা দেয় না ? যে সম থাকে তাকে। আপনারা সম থাকেন না তাই আপনারা কখনো সুখী হন, কখনো দুঃখী। আপনারা অযথা খুব কষ্ট করে বন্ধনকে ধরে রেখেছেন, কিন্তু তা টিকবে না। তবু আপনারা নতুন নতুন বন্ধনকে ধরতে থাকেন। শৈশব চলে গেলে যৌবনকে ধরলেন, আবার যৌবন চলে গেলে বৃদ্ধাবস্থাকে ধরলেন। আগন্তুককে ধরে মিছেই দুঃখ পেতে থাকেন। দয়া করে আপনারা নিজেদের স্বরূপে স্থিত থাকুন।

শ্রোতা—মহারাজ, তুলসীদাসের যখন শারীরিক কষ্ট হয়েছিল তখন তিনিও সমতা বজায় রাখতে পারেননি এবং তিনি হনুমানবাহুক রচনা করেছিলেন, তাহলে আমাদের এমন কী শক্তি আছে যে আমরা সম থাকব ?

স্বামীজী—তিনি সম থাকেননি সে তাঁর ইচ্ছা। আপনারা কেন সমতাভ্রষ্ট হন ? তুলসীদাস বা আর যে কেউ হন আমরা তো তাঁদের বিচার করছি না। আমরা করছি আমাদের। আপনারা সুখী-দুঃখী কেন হন ? কোথাও কি লেখা আছে যে যা তুলসীদাসজীর মধ্যে হয়নি তা আপনাদের মধ্যে হবে না ? তুলসীদাসের মধ্যে যে ব্যাধি হয়নি তা আপনাদের হয়েছে। তুলসীদাসের ছেলে-মেয়ে হয়নি, কিন্তু আপনাদের হয়েছে। তুলসীদাসের মধ্যে যা হয়নি এমন অনেক কিছুই আপনাদের

মধ্যে হয়েছে। আপনাদের যা কিছু হয়েছে তা সব কি তুলসীদাসের মধ্যে হয়েছিল ? আপনাদের মতো সব পরিস্থিতি কি তুলসীদাসেরও হয়েছিল ? তাহলে তুলসীদাসের কথা আনছেন কেন ?

আমি তো নিজের অনুভূতির কথা বলছি। তুলসীদাস, শঙ্করাচার্য প্রমুখ কারো কথাই বলছি না। আপনারা অনুভূতি লাভ করে দেখুন। যদি আপনাদের অনুভূতি লাভ করতে হয় তাহলে এদিক-সেদিকের কথা বলবেন না। আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে নিজেদের কল্যাণের ইচ্ছাই আপনাদের নেই। যে নিজের কল্যাণ চায় সে অন্য কথা বলতে পারে না। যার কল্যাণের প্রকৃত ইচ্ছা সে সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে ভজনে লেগে যাবে। কাউকে নিয়ে বিচারের কোনো প্রয়োজন নেই। কাউকে নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। খাবার পেলে খাবেন, না পান তো কোনো পরোয়া নেই—**'জাহি বিধি রাখে রাম তাহি বিধি রহিয়ে, সীতারাম সীতারাম সীতারাম কহিয়ে।'** খাবার না পেলে যদি মরে যান তো খাবার খেয়ে কি বেঁচে থাকবেন ? যে খাবার খায় সে কি মরে না ? সময় হলে সকলকেই মরতে হবে। তাই কে কী করল, না করল এসব না ভেবে আমাদের তো নিজেদের কল্যাণ করতে হবে।

কল্যাণ স্বতঃসিদ্ধ। বন্ধন স্বতঃসিদ্ধ নয়। বন্ধন হল কৃত্রিম এবং তা আপনাদের সৃষ্টি। আপনারা নিজেদের মধ্যেই তাকিয়ে দেখুন যে শিশুকাল থেকে আপনারা কি সেই একই আছেন ? নাকি অন্য হয়ে গিয়েছেন ? অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। দেশ, কাল, পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু আপনার স্বরূপত একই রয়েছেন। যা অনবরত বদলায় সেটিকে ধরে আপনারা কখনো সুখী, কখনো দুঃখী হয়ে থাকেন। আপনারা নিজেদের সত্তার স্থিত থাকুন। যা পরিবর্তিত হয় তাতে কেন স্থিত থাকেন ?

দৌড় সকে তো দৌড়লে, জব লগি তেরী দৌড়।
দৌড় থক্যা ধোকা মিট্যা, বস্তু ঠৌড়-কী-ঠৌড়॥

শ্রোতা—স্বামীজী, নিজের স্বরূপেও থাকতে হবে আবার

শরীরকেও দানাপানি দিতে হবে ....।

স্বামীজী—দুটিতেই নিজ স্বরূপে স্থিত হতে হবে। শরীরের পিছনে কেন পড়ে আছেন ? ওটি তো নাশ হচ্ছে।

শ্রোতা—তাকে তো দানাপানি দিতে হবে !

স্বামীজী—দানাপানি দিতে কে বারণ করছে ? আমি স্বপ্নেও কি কখনো নিষেধ করেছি ? কিন্তু এইজন্য এত গরজ কেন ? যার গরজ সে দিক্, বা নাই দিক্। আপনারা দেবার জন্য কোথা থেকে আনবেন ? লোকেরা এখান-সেখান থেকে দিয়েছেন, আবার এখান-সেখান থেকে নিয়েছেন, আপনারা কী করেছেন ? যা আছে তাকেই আপনারা ওলট-পালট করেছেন। খাদ্য দিতে হোক বা না হোক আপনাদের তার জন্য কোনো প্রয়োজন নেই। যিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁর প্রতি যদি মানুষের গরজ থাকে তো তারাই তাঁকে অন্ন-বস্ত্র দেবে, না হলে মরতে দেবে ! সেই মহাপুরুষের তো সংসারের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। সংসার থেকে কিছু নেবার নেই। দুধের জন্য যার গরজ সে দুগ্ধবতী গোরুকে নিজে থেকেই পালন করবে। তেমনি যাদের জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের প্রয়োজন তারা নিজে থেকেই তাঁর পালন-পোষণ করবে। না করলে তাঁর (সেই মহাপুরুষের) নেবারও কোনো গরজ নেই। তাঁর কাজ তো হয়ে গেছে।

প্রয়োজনানুসারে অন্ন গ্রহণ, জল পান এবং নিদ্রা—এই তিনটি জিনিস আমি নিষেধ করি না। ক্ষুধা পাবে, তেষ্টা পাবে, ঘুমও পাবে, এগুলি তো আসবেই, এগুলির সঙ্গে আপনাদের কী সম্পর্ক ? যেমন, কখনো রৌদ্র, কখনো ছায়া, কখনো বৃষ্টি, কখনো হাওয়া, কখনো ঠাণ্ডা, কখনো গরম হয় তেমনই কখনো ক্ষুধা পায়, কখনো তেষ্টা পায়। কখনো সংযোগ হয়, কখনো বিয়োগ হয়। এতো হতেই থাকে। এগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার কী আছে ? হলেই বা কী, না হলেই বা কী ! আপনারা যেমনকার তেমনই থাকেন। এটি প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা !

মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ

লোকেরা মোটামুটি এই কথা ভেবে নিয়েছেন যে তাঁরা চেষ্টা করে বিশেষ স্থিতি লাভ করবেন আর তাহলেই তাঁদের কল্যাণ হবে। এটি ভালো, তবে সম্পূর্ণ ভালো নয়। প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ, মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ—তা কিছু করলে হয় না। কিন্তু আজ একথা যে বলে সে অপরাধী। লোকেরা তার বিরোধিতা করে, সে ঠিক বলছে না, ভুল বলছে। কিন্তু বাস্তবে কথাটি তাই। আমরা যা কিছুই করি তা প্রকৃতিজাত বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না করে হতে পারে না। বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করাই হল বন্ধন। আমরা কিছু করলে শরীরের সাহায্য নিতে হবে, ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্য নিতে হবে, বুদ্ধির সাহায্য নিতে হবে, অন্তত একদেশীয় (পরিচ্ছিন্ন) 'অহং'-কে ধরে নিয়েই কিছু করতে হবে। নিজেকে যদি পরিচ্ছিন্ন না করেন, কারো প্রতি মমত্ব না করেন তাহলে নিজেকে দিয়ে কী করে করা যাবে ? অতএব কিছু করায় মুক্তি হয় না। করার দ্বারা যা হয় তা বিনাশশীল। কেননা প্রত্যেক ক্রিয়ার শুরু এবং শেষ হয়। ক্রিয়া থেকে যে ফল পাওয়া যায় তারও সংযোগ ও বিয়োগ হয়ে থাকে। যা করা হয় তা কখনো নিত্য হয় না।

ত্যাগে মুক্তি হয়। বস্তু এবং ক্রিয়ারূপে যে প্রকৃতি তার প্রতি যদি আমাদের মমতা এবং অহংত্ব না থাকে তাহলে আমাদের মুক্তি স্বতই হয়ে যায়। আমরা নিজেরাই মমত্ব এবং অহংত্ব নিয়ে বন্ধন সৃষ্টি করেছি। আমরা নিজেরা তাকে দূর করলে তবেই সে যাবে। নইলে গুরু তাকে দূর করতে পারেন না, সাধু পারেন না, ভগবানও পারেন না। আপনারা যখন নিজেদেরকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করে দেবেন তখনই ভগবান দূর করতে পারেন, না হলে ভগবান নিজে থেকে তা দূর করেন না। যত ভালো লোক হয়েছেন তাঁরা কেউই তোমরা এইটি করো বলে কারো ওপর কিছু চাপিয়ে দেননি। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেবে,

হিতকথা বলে দেবে, কিন্তু জবরদস্তি করবে না। আমরা তো বলে দিই যে ভগবানের উচিত আমাদের উদ্ধার করে দেওয়া। কিন্তু আমরা যদি ভগবানের শরণাগত না হই তাহলে তিনি আমাদের উদ্ধার কী করে করবেন ? ভগবান কারো স্বাধীনতা কেড়ে নেন না। আপনারা যদি ভগবানকে সব রকমের স্বাধীনতা দিয়ে দেন তাহলে ভগবান সব কাজ করে দেবেন।

আপনাদের অহংত্ব এবং মমতাই পতনের মূল। কোনোভাবে যদি এটিকে দূর করতে পারেন তাহলে উদ্ধার পেয়ে যাবেন। কথাটি এতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে এর মহিমা আমি বলে শেষ করতে পারি না, আমরা যদি শরীরের প্রতি মমতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করি তাহলে শরীর সহজে অসুস্থ হবে না। ইন্দ্রিয়গুলির প্রতি যদি মমতা ত্যাগ করি তাহলে তাতে দোষ থাকবে না। মনের প্রতি যদি মমতা ত্যাগ করি তাহলে মনে দোষ থাকবে না। বুদ্ধির প্রতি যদি মমতা ত্যাগ করি তাহলে বুদ্ধিতেও দোষ থাকবে না। তেমনি অহং ভাবের প্রতি যে মমতা (নিজস্বতা) তাকেও যদি ত্যাগ করে দেন তাহলে কোনো দোষই থাকবে না। মূল কথা হল এই যে আমরা যে সম্বন্ধ যুক্ত করি তাতেই সকল দোষের সৃষ্টি হয়। আমরা যত সম্বন্ধ জুড়ে আগ্রহ করি, মমতা করি তাতে ততই দোষ এসে যায়, অশুদ্ধি এসে যায়। যদি সম্পূর্ণরূপে মমতা এবং অহংত্ব ত্যাগ করি তাহলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করতে কষ্ট হয়। মন দিলে বোঝা যাবে। কিন্তু লোকেরা এই দিকে মন দেন না।

এখন প্রশ্ন হল, মুক্তি হলে জীবের জন্ম-মৃত্যু বন্ধন দূর হয়ে যাবে, তাহলে তো জগৎসংসারও শেষ হয়ে যাবে। কেননা যত জীবের মুক্তি হবে ততগুলি জীব জগতে কম হতে থাকবে আর এইভাবে কম হতে হতে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এইজন্য মুক্তি হয়ে গেলে আর জন্ম হবে না এমন কথা নয়। জীব মহাপ্রলয় পর্যন্ত জন্ম নেয় না, কিন্তু মহাসর্গে আবার জন্মগ্রহণ করে। মানুষেরা এই রকম সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করে

নিয়েছে। এর কারণ কী ? তা হল, মানুষেরা এই ধারণা করে রেখেছে যে মুক্তি হল কৃত্রিম, আমরা চেষ্টা করলে তা হয়। এইজন্য তা চিরকাল কী করে থাকবে ? কিন্তু বাস্তবে মুক্তি হল স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক, কৃত্রিম নয়। চেষ্টা করা হল অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিকতাকে দূর করে নিলে স্বাভাবিকতা যেমনকার তেমনি থাকবে। এই বিষয়টির গভীরে গিয়ে বুঝুন।

আপনারা একটু ভেবে দেখুন যে যে টাকা-পয়সাকে আপনারা নিজেদের বলে মনে করেছেন তার জন্যই আপনাদের চিন্তা হয়। পৃথিবীতে তো অগণিত টাকা-পয়সা রয়েছে সেগুলির জন্য আপনাদের চিন্তা হয় না। তাহলে চিন্তার কারণ টাকা-পয়সা নয়, তা হল নিজস্বতা বোধ। যে লোকেদের আপনারা আপনজন বলে মনে করেন তাদের লাভ হলে আপনারা সুখী হন এবং তাদের ক্ষতি হলে আপনারা দুঃখিত হন। কিন্তু যাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই তাদের লাভ হোক অথবা ক্ষতি হোক, তারা মরুক বা বেঁচে থাকুক তাতে আমাদের কোনো রকম সুখ বা দুঃখ হয় না। যাদের প্রতি মমতা, তারাই বন্ধন। যাদের প্রতি মমতা নেই আমাদের উপর তাদের কোনো বন্ধনও নেই।

চিন্তা করলে দেখবেন যে মমতা ত্যাগ করা খুবই সহজ। যাকে আমরা 'আমার' বলে মনে করেছি তাকে 'আমার নয়' ভেবে নিলেই আমরা স্বাধীন, অধীনতামুক্ত হয়ে যাব। কিন্তু তার কাছ থেকে সুখ ইচ্ছা করি বলেই আমরা পরাধীন হয়ে যাই। সম্বন্ধ যুক্ত করে সুখে যদি ফেঁসে যান তাহলে পরাধীনতা থেকে বাঁচতে পারবেন না। ভগবান পরিষ্কার বলেছেন—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।। (গীতা ৫।২২)

সম্বন্ধজনিত যে সুখ তা দুঃখেরই কারণ এবং তা আদি-অন্তযুক্ত। এইজন্য বিবেকী পুরুষ তাতে সঞ্চরণ করেন না। যে তাতে সঞ্চরণ করে

না তার কল্যাণ হয়।

সম্বন্ধজনিত সুখের লোলুপতাই সংসারে বন্ধনের কারণ। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। আমি পড়েছি, সৎসঙ্গ করেছি, বক্তৃতা দিয়েছি—এত করেও আমি বুঝতে পারিনি যে ব্যাপারটা কী ? এই বন্ধন কোথায় ? পরে সাধুদের কৃপায় আমি বুঝতে পেরেছি যে সম্বন্ধজনিত যে সুখ সেইটিই মূল বন্ধন। সুখের ইচ্ছা সমাধা পর্যন্তও থাকে। সুখের এই ইচ্ছাই বন্ধনকারক। এই কথাটি আপনারা পুরোপুরি বিশ্বাস করুন।

শ্রোতা—মনে হচ্ছে কথাটি সত্যি।

স্বামীজী—কথা সত্য বলে যদি মনে হয় তাহলে সংশয় দূর হয় না কেন ? নিশ্চয় কোথাও না কোথাও দোষ আছে। যে কথায় মনের সংশয় দূর হয় সেই কথাকে সম্মান করুন, সংশয় যদি গোলমাল সৃষ্টি করে তাহলে তার মূলে কী আছে সে দিকে দৃষ্টি দিন। যেখানেই মনের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় সেখানেই স্বয়ং চিন্তা করুন যে মূলে কোথায় দোষ রয়েছে ? দোষটা কী ? দেখবেন যে কোথাও না কোথাও মমতা রয়েছে, পক্ষপাত করা হয়েছে, সুখভোগের ইচ্ছা রয়েছে, কিছু লাভের ইচ্ছা করা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে, কিছু নেওয়ার। তা না হলে চাঞ্চল্য হতেই পারত না।

শ্রোতা—পরমাত্মার জন্য যখন ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়েছে তখন তাতে যদি কোনো সাংসারিক সুখ এসে যায় তাহলে আমরা সেই সুখের দিকেই ধাবিত হই, ব্যাকুলতার দিকে যাই না। এই অবস্থায় আমরা কী করব ?

স্বামীজী—ব্যাকুলতাতেই থাকবেন, ভোগে যাবেন না। ভোগকে ধরতে যাবেন না, ভোগের কারণ অর্থাৎ অনুরাগকে লক্ষ্য করুন এবং তাকেই দূর করুন।

আমাদের এই যে আলোচনা এটি খুবই লাভদায়ক। নিজে নিজে

চিন্তা করলে এই বাধা দূর হবে না। নিজেদের মধ্যে যদি খোলাখুলি চিন্তা করেন তাহলে এটি দূর করতে সাহায্য পাবেন। এটি আমি দেখেছি। আমাকে যদি কেউ বুঝিয়ে দেয় তাহলে আমার পক্ষে সেই কাজ খুব সহজ হয়ে যায়। নিজে থেকে চিন্তা করলে, অনুধ্যান করলে তাতেও লাভ হয়। কিন্তু অপরে বুঝিয়ে দিলে তা সহজতর হয়। আমার প্রকৃতি যখন এইরকম তখন মনে হয় অন্যের প্রকৃতিও এইরকমই হবে। আমার এই যে বোঝাবার প্রবৃত্তি একে আমি ভালো মনে করি না। অপরকে উপদেশ দেওয়া, অপরকে বোঝান হল নিজের মূর্খতাকে স্বীকার করা, নিজের অহংকারকে স্বীকার করা। অপরকে নির্বোধ মনে করা। অপরকে নির্বোধ এবং নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করা গুণ নয়, দোষ। এটি পতনের কারণ। একথা মেনে নিয়েও আমার বোঝাবার প্রবৃত্তি হয়। কেন হয় ? তার কতকগুলি কারণ হতে পারে। চিন্তা করে দেখলে মনে হয় যে আমাকে কেউ বোঝালে যখন আমার লাভ হয় তখন অন্যকে যদি আমি বোঝাই তাহলে তারও লাভ হবে। এইজন্যই আমার বোঝাবার প্রবৃত্তি হয়। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় আর এইরকম অনুষ্ঠান করলে খুবই সাহায্য পাওয়া যায়। অতএব নিজেদের মধ্যে চিন্তাভাবনা হোক। চিন্তার আদান-প্রদান হোক। কেবল উপদেশ দিয়ে শুরু হয়ে যাওয়াতে কোনো লাভ নেই। পরস্পরকে সমান মনে করে আলোচনা করা উচিত। কোনো বিষয় আমি জানি আবার অন্য কোনো বিষয় আপনারা জানেন, তাহলে মোট সমান হল। তাই না ? এইভাবে সমান সমান হয়ে চিন্তা করুন। আপনাদের কথা আমি মেনে নেব, আমার কথা আপনারা মেনে নেবেন। তাতে আমাদের দুজনেরই লাভ। কিন্তু এটি হবে কবে ? তখনই হবে যখন বক্তার মনে এই অহংকার থাকবে না যে তিনি সব জানেন আর অন্যেরা কিছুই জানেন না। আমাদেরও জানার আছে

এবং আপনাদেরও জানার আছে। এই রকম মনে করে আলোচনা করলে আমরা অনেক কিছু জানব, আমাদের জ্ঞান হবে।

শ্রোতা—বিগত দিনের সুখ সর্বদা মনে পড়ে।

স্বামীজী—তাহলে সুখভোগের পরিণাম ভালো হল না তো ! এখনও পর্যন্ত সেই সুখভোগের সংস্কার পড়ে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত সেই সংস্কার থেকে মুক্তি হয়নি। অতএব এই সুখভোগের আসক্তি ছাড়তে হবে এটি প্রমাণিত হল।

সুখের লোলুপতা কী করে দূর হবে ? এটি প্রশ্ন। সুখের প্রতি লোলুপতার কারণে আমরা ফেঁসে যাই। জেনে, বুঝে, পড়ে, বলেও আমরা ফেঁসে যাই। অতএব তা থেকে মুক্তি পাবার সহজ-সরল উপায় হল অপরের সুখ কী করে হবে—এই চিন্তা মনে গেঁথে রাখুন। ঘরে মা-বাবার সুখ কী করে হবে ? স্ত্রীর সুখ কী করে হবে ? ছেলেমেয়েদের সুখ কী করে হবে ? ভাই, ভাইয়ের স্ত্রীর সুখ কী করে হবে ? প্রতিবেশীর সুখ কী করে হবে ? বিশ্বের সুখ কী করে হবে ? বন্ধুদের সুখ কী করে হবে ? আমি কী সেবা করতে পারি যাতে এদের সুখ হয়, এদের কল্যাণ হয়, এদের হিত হয় ? এদের কথা কী করে রাখা যায় ? এদের সম্মান কী করে হয় ? এদের প্রশংসা কী করে হয়—এই বৃত্তি যদি আপনাদের মধ্যে জোরদার হয়ে যায় তাহলে সুখভোগের রুচি দূর হবে।

'বহুত প্রীতি পুজাইবে পর, পূজিবে পর থোরি।'

(বিনয় পত্রিকা ১৫৮)

মান-সম্মান পাওয়ার খুবই ইচ্ছা, অথচ অপরকে মান-সম্মান জানানোর ইচ্ছা প্রায় নেই। সুখ পেতে খুবই ইচ্ছা, সুখ দিতে তেমন নয়। যদি দেওয়ার ভাব (সেবার ভাব) হয়ে যায় তাহলে কাজ হয়ে যাবে।

শ্রোতা—সুখ নিলে তো তৎক্ষণাৎ তা পাওয়া যায়, কিন্তু সুখ দিলে তো তখনই সুখ পাওয়া যায় না।

স্বামীজী—লেখাপড়া করার সময় ছেলেরা তাতে সুখ দেখতে পায় না, খেলাতে সুখ দেখে। কিন্তু গুরুজনরা পড়ালে পড়া শুরু করে, কয়েকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়ে যায় আর তখন পড়াতে মন লেগে যায়। অতএব এটি শুকনো শিলার মতো। শুকনো শিলা নোনতা নয়, মিষ্টি নয়, তাতে কোনো স্বাদ নেই। তাহলে শুকনো শিলাকে কে চাটবে ? কিন্তু কেউ যদি বলে চাটো, ঠিক হয়ে যাবে তাহলে তার কথায় চাটতে থাকবে। এইরূপেই মনে করবেন যে ইনি (স্বামীজী মহারাজ) যখন এত করে বলছেন অতএব এই সুখকে ত্যাগ করে অপরকে সুখ প্রদান করতে আরম্ভ করুন। এইটুকু বিশ্বাস তো রয়েছে যে ইনি আমাদের ভালোর জন্যই বলছেন। ভগবানের কথা আমাদের কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে, এইজন্য তাঁর কথায় শুরু করে দিন। ভগবান বলেছেন যে সাত্ত্বিক সুখ শুরুতে বিষের মতো আর পরিণামে অমৃতের মতো—**'যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্'** (গীতা ১৮।৩৭) শুরুতে বিষের মতো এই কথাটি প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। সাত্ত্বিকতায় তো শুরুতেই আনন্দ, সুখ, আর ভগবান বলছেন শুরুতে বিষবৎ, এ কেমন ? চিন্তা করার পর বুঝতে পারলাম যে রাজস-তামস সুখ ত্যাগ করার মধ্যে কঠিনতা আছে, এজন্য সাত্ত্বিক সুখ প্রথমে বিষের মতো মনে হয়।

আপনারা এই কথাটি চিন্তা করুন যে অপরের সুখ কী করে হবে ? অপরের কথা কী করে থাকবে ? অপরের কল্যাণ কী করে হবে ? ভগবান বলেছেন যে যার প্রীতি প্রাণীমাত্রেরই হিতের প্রতি সে আমাকে প্রাপ্ত করে—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।'** (গীতা ১২।৪) যারা আমাদের দুঃখ দেয় তাদেরও সুখ কী করে হবে ?—**'উমা সন্ত কই ইহই বড়াঈ। মন্দ করত জো করই ভলাঈ॥'**

(রামচরিতমানস ৫।৪১।৪)। তাহলে সাধুতা জাগ্রত হবে।

অপরের কল্যাণ করায় আমাদের নিজেদেরও কল্যাণ। যেমন, আমরা দর্পণে মুখ দেখি। আমাদের মুখ যদি পূর্ব দিকে থাকে দর্পণে দেখব পশ্চিম মুখো। আমাদের দক্ষিণ দর্পণে বাম হয়ে যাবে, বাম হবে দক্ষিণ। এখন দর্পণে যেমন দেখা যায় সেই অনুসারে যদি আমরা চলি তাহলে বিপরীত দিকে যাওয়া হবে। সংসাররূপী দর্পণে সুখ নেওয়া ভালো দেখায়, আর সুখ দেওয়া দেখায় খারাপ। সেই অনুসারে চললে অবস্থা খারাপ হবে, কেননা শুরুতেই জ্ঞান বিপরীত হয়ে গিয়েছে ! **'ধুর বিগড়ে সুধরে নহীঁ, কোটিক করো উপায়।'** শুরুতেই কাজ বিগড়ে গিয়েছে। মনে হবে যেন আমাদের স্বার্থ পূরণ হয়েছে, আমরা সুখ পেয়ে গিয়েছি, কিন্তু পরিণামে দুঃখই হবে। তাই যদি নিজেদের কল্যাণ চান তাহলে এই ব্যবহার বদলাতে হবে। নইলে কেবল ঝামেলাই সৃষ্টি হবে। অপরকে সুখ প্রদান করলে নিজের সুখ ভোগের ইচ্ছা দূর হবে। এটি সকলের অভিজ্ঞতালব্ধ কথা।

শ্রোতা—সেবা করলে তখনই সুখ তো পাওয়া যায় না, কিন্তু অহঙ্কার অবশ্যই তখন হয়ে যায়।

স্বামীজী—অহঙ্কারেও তো এই একটি সুখ হয় যে আমি এইরকম। আমাদের অহঙ্কারের এই সুখও দূর করতে হবে—এরূপ চিন্তা রাখলে তা দূর হয়ে যাবে। যেমন নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে হবে এই কথা চিন্তা করলে নিজের ছেলের প্রতি যত মমতা হয় মেয়ের প্রতি ততটা থাকে না। এই রকমই অহঙ্কারের সুখকেও ত্যাগ করতে হবে—এই চিন্তা যদি পাকা হয়ে যায় তাহলে অহঙ্কারজনিত সুখের প্রতিও মমতা থাকবে না।

তত্ত্ব প্রাপ্তিতে বিলম্ব নেই

যা আমাদের উন্নতির পক্ষে ঠিক নয়, সত্য নয়, আমাদের কাছে লাভদায়ক নয় তাকে ত্যাগ করুন। শুধু এইটুকুই কথা, লম্বা-চওড়া এমন কিছু নয়। ত্যাগের দ্বারা তখনই শান্তি পাওয়া যাবে— **'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'** (১২।১২)। তাতে যদি কোনো বাধা থাকে তো বলুন, তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। পরিষ্কার করে, সহজভাবে বলুন। এতে মান, অপমান, স্তুতি-নিন্দা, লোকেরা কী বলবে, না-বলবে সে কথা ছেড়ে দিন। যদি নিজের কল্যাণ চান তাহলে লোকেরা যাই বলুক, যাই করুক সে দিকে মন দেবেন না।

তেরে ভাবৈ জো করৌ, ভলৌ বুরৌ সংসার।
'নারায়ন' তূ বৈঠকে, অপনৌ ভবন বুহার॥

ত্যাগের, কল্যাণের কাজ বর্তমানেই করতে হবে। এই কাজ ধীরে ধীরে করার, অনেক দিন ধরে করার—তা নয়। কিন্তু মানুষের মনে এই কথা দৃঢ় হয়ে আছে যে এতে তো সময় লাগবে ? সুধীবৃন্দ ! আমি অনেক চিন্তা করেছি। এই কাজ ভবিষ্যতের জন্য নয়। সেই বিষয়টিই ভবিষ্যতে থাকে যাকে তৈরি করতে হয়। তৈরি করতে সময় লাগে। কিন্তু যা আগে থেকেই আছে তাতে সময় লাগে না। তা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং যা আমার জ্ঞানে মিথ্যা, অসত্য, ঠিক নয়, লাভদায়ক নয়, তাকে ত্যাগ করতে হবে। ব্যস। যা ত্যাগের তা তাৎক্ষণিক। ত্যাগ ধীরে ধীরে হয় না। গ্রহণও ধীরে ধীরে হয় না।

ভগবান বলেছেন—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'**। (গীতা ২।১৬) 'অসৎ বস্তুর সত্তা নেই আর সৎ বস্তুর অনস্তিত্ব নেই।' আবার বলেছেন **'উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।'** এই দুটি তত্ত্বকে তত্ত্বদর্শী পুরুষরা দেখেছেন। দেখেছেন—এই কথা বলেছেন ; করেছেন, এমন কথা বলেননি। করতে সময় লাগে,

দেখতে সময় লাগে না। যদি দেরি হয়, সময় লাগে, তাহলে আপনারা দেখা পছন্দ করেননি, করা পছন্দ করেছেন। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ— এগুলি তাৎক্ষণিক সিদ্ধ হয়। এগুলির সিদ্ধি বর্তমান কালের। এগুলি যদি বর্তমান কালের না হত, এখনই সিদ্ধ হওয়ার না হত তাহলে কেমন করে সিদ্ধ হত ? একে তৈরি করতে হয় না, কোথাও থেকে আনতে হয় না, কোথাও নিয়ে যেতে হয় না, এতে কোনো পরিবর্তন করতে হয় না। তাহলে এতে সময়ের কোন প্রয়োজন ? এটি চিন্তা করুন।

শ্রোতা—মহারাজ ! আমাদের মধ্যে এমন ধারণা দৃঢ়মূল যে মহারাজের ত্যাগ-বৈরাগ্য ছিল, সাধনা ছিল, তাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে কাজ চটপট হয়ে গিয়েছিল। আমাদের অন্তঃকরণ তো শুদ্ধ নয়, এইজন্য আমাদের হৃদয়ে এ স্থান পায় না।

স্বামীজী—আপনাদের এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি আপনাদের একটি কথা বলেছি। আপনাদের বিশ্বাস করার এমন সামর্থ্য আমার নেই। এই কথা তো আমার মধ্যে বসে গিয়েছে তাহলে আপনাদের মধ্যে বসবে না, এমন হতে পারে না। আপনাদের অন্তঃকরণ যতই অশুদ্ধ হোক, গীতা বলেছে—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্য পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজনং সন্তরিষ্যসি॥ (৪।৬)

'তুমি যদি সকল পাপীর চেয়েও বেশি পাপী হও তাহলেও তুমি জ্ঞানরূপী নৌকার দ্বারা নিঃসন্দেহে পাপসমুদ্র ভালোভাবে পার হয়ে যাবে।'

'পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ'—বলে শেষ কথা বলে দিয়েছেন। সংস্কৃতের এই বোধ তো সকলের হবে যে **'পাপেভ্যঃ'** শব্দ বহুবচন হওয়ায় তা সকল পাপীর বাচক, তবু এর সঙ্গে **'সর্বেভ্যঃ'** শব্দ দিয়েছেন। **'সর্বেভ্যঃ'** শব্দও সম্পূর্ণতার বাচক। এখন চিন্তা করুন যে, এই দুটি শব্দ দেওয়ার পরেও ভগবান **'পাপকৃত্তম'** শব্দটি দিয়েছেন।

এটি অতিশয়োক্তি বাচক। প্রথমে **'পাপকৃত'** হয়, তারপর **'পাপকৃত্তর'** এবং শেষে **'পাপকৃত্তম'**। এটি শেষ কথা, সমগ্র সংসারে যত পাপী হতে পারে, সেই পাপীদের চেয়েও যে অত্যধিক পাপী, তার অন্তঃকরণ কত অশুদ্ধ হবে, বলুন। আপনাদের কি মনে হয় যে আমিও এই রকমই পাপী ? মনে হয় না তো । ভগবান বলেছেন যে এই রকম ভীষণ পাপীও জ্ঞানরূপী নৌকার দ্বারা সকল পাপ পার হয়ে যায়। এই কথা বলে পরবর্তী শ্লোকে বলেছেন—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎকুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎকুরুতে তথা॥ (৪।৩৭)

'হে অর্জুন ! প্রজ্বলিত আগুন যেমন ইন্ধনকে সম্পূর্ণরূপে ভস্ম করে দেয়, সেই রকম জ্ঞানরূপী আগুনও সকল কর্মকে সম্পূর্ণরূপে ভস্ম করে দেয়।'

যে আগুন সাধারণ নয়, যা ভীষণ প্রজ্বলিত তার জন্য **'সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ'** শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। **'অগ্নিঃ'** শব্দ এক বচন। তার সঙ্গে বহুবচন শব্দ 'এধাংসি' (ইন্ধন) দেওয়া হয়েছে। ভস্মের জন্য **'ভস্মসাৎ'** শব্দ বলেছেন, **'ভস্মসাৎ'**-এর অর্থ হল সম্পূর্ণরূপে ভস্ম করা, তার ছাইও যেন না বাঁচে। এইভাবে জ্ঞানরূপী আগুন সকল পাপকে ভস্মসাৎ করে দেয়। প্রথমে বলেছেন, জ্ঞানরূপী নৌকার দ্বারা সমস্ত পাপ-সমুদ্র পার হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এইজন্য দিয়েছেন যে সমুদ্র পার হয়ে গেলেও সমুদ্রের অবসান হয় না, সমুদ্র থেকেই যায়। ওই থেকে যাওয়ার সন্দেহকে দূর করতে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে জ্ঞানরূপী আগুনে সকল পাপ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়, কোনো পাপ বাকি থাকে না। এখানে **'কর্মাণি'** বললেই কাজ হয়ে যেত, তবু তার সঙ্গে **'সর্ব'** শব্দ দিয়েছেন। তাৎপর্য হল এই যে সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ এবং ভাগ্য—সকল কর্মই বিনষ্ট হয়ে যায়। তাহলে এখন আর দেরি কীসের ?

শ্রোতা—মহারাজ ! আপনি যা বলছেন যুক্তিতে তাকে ঠিক বলেই

মনে হয়। কিন্তু নিজের অন্তঃকরণের অবস্থা দেখে মন সংশয়াকুল হয়ে ওঠে, সেখানে সবই তো ফাঁপা।

স্বামীজী—এবার মন দিয়ে শুনুন। অন্তঃকরণ 'করণ', নাকি 'কর্তা'। এটি তো করণ আর তত্ত্ব করণসাধ্য (করণের দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য) নয়, তা তো করণ-নিরপেক্ষ। তা যদি করণসাধ্য হত তাহলে আমি আপনার কথা ঠিক বলে মেনে নিতাম। সেইটি করণ সাধ্য যাকে তৈরি করা যায়, কোথাও থেকে আনা যায়, কোথাও নিয়ে যাওয়া যায়, যার পরিবর্তন করা যায়। এইভাবে ক্রিয়ার দ্বারা যার কোনো-না-কোনোরকম বিকৃতি হয় সেইখানে করণ কাজ করে। যাতে বিকৃতি আসে না সেখানে করণ কাজ করে না। তত্ত্বপ্রাপ্তিতে করণের জন্য প্রতীক্ষা নেই। করণ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে হবে। আরে ভাই, যাকে ত্যাগ করতে হবে তাকে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ করার কী আছে ? শুদ্ধ হলেও ছেড়ে দিতে হবে, অশুদ্ধ হলেও ছেড়ে দিতে হবে।

শ্রোতা—**'সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ' (গীতা ১৪।২৪) 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্'** (গীতা ১২।১৩) প্রভৃতি লক্ষণগুলি যদি অনুভূত হয় তাহলে মনে হবে যে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়েছে। সেইরকম লক্ষণ না দেখলে মনে হয় যে কিছুই হয়নি।

স্বামীজী—দেখুন, আমি কাল রাত্রেও বলেছি এবং এখনও বলছি। আপনি এটা তো বিশ্বাস করেন যে আমি আপনাকে ঠকাচ্ছি না ?

শ্রোতা—হ্যাঁ, সেই বিশ্বাস আছে।

স্বামীজী—আমি আপনাকে বলছি যে আপনি যত বড় পাপীই হন, তা বড় পাপী হলেও এখনই আপনার বোধ আসতে পারে। একথা কেবল আমার জন্য নয়। আমার জন্যই যদি হত তাহলে আপনাদের বলতাম কেন ? আপনাদের জন্য, আমার জন্য, উভয়ের জন্যই এই কথা। আমাদের পাপের শ্রেণী যত বড়ই হোক, যত ডিগ্রি পাপই হোক, তা কোনো ব্যাপারই নয়। সমস্ত পাপ ভস্মাসাৎ হয়ে যায়।

শ্রোতা—মহারাজ ! পাপের বাসনাও কি দূর হতে থাকে ?

স্বামীজী—পাপের বাসনা আসে তো আসুক। আমার এই একটি কথা মেনে নিন। মনে যদি পাপ আসে তো আসতে দিন, খারাপ সংকল্প যদি আসে তো আসতে দিন। এতে আপনি একেবারে ভয় পাবেন না। কষ্টিপাথরে তার যাচাই করবেন না। পাপ টিকবে না। নিজে নিজেই ভস্ম হয়ে যাবে। পাপ করণের উপর টিকে নেই। পাপ কর্তার উপর টিকে আছে। এইজন্য করণ শুদ্ধ নয়, তার চিন্তা আপনারা কেন করেন ? কর্তা শুদ্ধ হলে করণ নিজে নিজেই শুদ্ধ হয়ে যাবে। এইটি চিন্তা করুন যে কর্তা শুদ্ধ হলে করণ কী করে অশুদ্ধ থাকবে ? আপনি নিজে যদি ঠিক থাকেন তাহলে কলম কি ভুল লিখবে ? কলম তো করণ, আর কর্তা আপনি। গীতা **'অপি চেতসি'** 'তুমি যদি এমন হও'—একথা বলেছে। 'করণ যদি এমন হয়' একথা বলেনি।

আপনারা এতজন বসে আছেন। আপনাদের মধ্যে কেউ একথা একেবারেই বলতে পারবেন না যে আমি সংসারের সকল পাপীর চেয়েও বড় পাপী। নম্রতা প্রদর্শনের জন্য যদি বলেও দেন যে আমি এত বড় পাপী, **'মো সম কৌন কুটিল খল কামী', তবু নিজের হৃদয়ে 'তত্ত্বপ্রাপ্তিতে দেরি নেই'** একথা যেমন স্থান পায় না, তেমনি আমি সবচেয়ে বড় পাপী, এই বিশ্বাসও হয় না। কেউ মানতেই পারেন না যে আমি সৎসঙ্গ করি, নাম-জপ করি, পূজা-পাঠ করি, সন্ধ্যা-আহ্নিক করি, কিছু না কিছু তো করিই। তাহলে কী করে মেনে নেব যে আমি সবচেয়ে বড় পাপী ? যদি এমন হয় তাহলে জ্বালা সৃষ্ট হবে । জ্বালা সৃষ্টি হলে কল্যাণ হবে, দেরি হবে না। এই যে জ্বালা এতে পাপকে বিনষ্ট করবার অনেক শক্তি আছে।

শ্রোতা—মহারাজ ! বদ্ধমূল সংস্কার হল এই যে সাধনার দ্বারাই হবে, ভজন, জপ, কীর্তনের দ্বারাই হবে। বইতেও বার বার এই কথাই পড়ি। ফলে এই কথা ভিতরে গেঁথে গিয়েছে।

স্বামীজী—আমি যে বই পড়িনি তা নয়, আমিও বই পড়েছি। আর আমি যে কথা বলি তাও বই থেকেই বলি। আমি এখন গীতা থেকে যে দুটি শ্লোক বললাম তাতে সময় লাগবার কথা কোথায় আছে ? এই কথা

এখানে যেসব জ্ঞানেতে বলা হয়েছে, তেমনি ভক্তিতেও বলা হয়েছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

(গীতা ৯।৩০)

'যদি কোনো ভীষণ দুরাচারীও অনন্যভাবে আমার ভজনা করে তবে তাকে সাধু বলে মনে করা উচিত। কেননা সে খুব ভালোভাবে নিশ্চয় করে নিয়েছে।'

দুটি জায়গাতেই (৪।৩৬ এবং ৯।৩০) **'অপি চেৎ'** কথাটি এসেছে। তাৎপর্য হল, তুমি এমন নও, তবে তুমি বা আর কেউ যদি এমন হও তাহলেও কল্যাণই হবে। যদি এই প্রকারের না হন তাহলে বলার সার্থকতা কোথায় ? **'সাধুরেব স মন্তব্যঃ'**—'তাকে সাধু বলে মানা উচিত' একথা বলার কী অর্থ ? তোমার মধ্যে সাধুগিরি দেখা যায় না, **'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্'** না দেখা গেলেও মেনে নাও। জ্ঞানের ক্ষেত্রে জেনে নাও ভক্তিতে তাকে মেনে নাও। এই দুটি কথা তত্ত্বের দ্বারা জানার অন্তর্গত।

তত্ত্বত মেনে নেওয়ার নামই হল জানা। মেনে নেওয়ার যা প্রভাব তা জানার থেকে কম নয়। যেমন শিশু মেনে নেয় যে, এ হল আমার মা। এটি হল মানার কথা, জানার বা অভিজ্ঞতার কথা নয়। **'যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্'**। (গীতা ১০।৩) এখানে 'বেত্তি'-র অর্থ মানা, জানা নয়, কেননা মানুষ ভগবানকে অনাদি বলে জানবে কী করে ? একে তো মানতেই হবে। এইভাবেই **'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ'** (৪।৯)। এতেও মানার কথা। কেননা ভগবানের জন্ম ও কর্মকে সেই জানতে পারে যে ভগবানের জন্ম ও কর্মের আগে ছিল। ভগবানের জন্ম ও কর্মের (উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি) আগে কে ছিল ? অতএব এখানে 'তত্ত্বতঃ বেত্তি'-র অর্থ দৃঢ়ভাবে মানাই। **'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা ....'** (৫।২৯)—এতেও 'জ্ঞাত্বা' মানার অর্থে

ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রোতা—এতে মহারাজ, পরোক্ষ জ্ঞান এবং অপরোক্ষ জ্ঞান ....?

স্বামীজী—দেখুন, এখন পুঁথিগত বিদ্যার কোনো কথা আনবেন না। বইয়ের প্রমাণ দেখিয়ে আমাকে যদি চুপ করাতে চান তো আমি চুপ করে যাব। আর কী হবে ? কিন্তু পরিণাম কী হবে ? নিজের সমস্যার কি কোনো মীমাংসা হবে ? আমি পরিষ্কার বলছি, জ্ঞান পরোক্ষ হয় না, হতে পারেই না। জ্ঞান অপরোক্ষই হয়। জ্ঞান হলে তা পরোক্ষ কী করে হবে ? আর পরোক্ষ হলে তা জ্ঞান হবে কী করে ? অনুভূতি দুরকম কেমন করে হবে ? জানা দুটি কী করে হবে ? তা নিয়েও খুব চিন্তা করুন, আমিও তাই চিন্তা করেছি। বই থেকে লাভ হয়, কিন্তু ক্ষতি হয় বেশি। এই কথাকে তো নাস্তিকতা বলে মনে হয়। কিন্তু আমার বিচার এই রকমই। যদি আপনি নিজের কল্যাণ চান তাহলে এখনই এই সব কথা ত্যাগ করুন, অনুভূতি পরোক্ষ হয়ই না।

শ্রোতা—কোনো জিনিসকে মেনে নিলে সেটি হয় পরোক্ষ জ্ঞান ..।

স্বামীজী—এটি মান্যতার কথা নয়, এটি হল শেখা বুলি। মান্যতার কথা এক জিনিস আর শেখা বুলি অন্য, জানা কথাও অন্য। টিয়াপাখি 'রাধাকৃষ্ণ, গোপীকৃষ্ণ' বলতে শিখে নিলে, সে কি পরোক্ষ-জ্ঞানী হয় ? পরোক্ষ জ্ঞান হতেই পারে না। যা পরোক্ষ তা জ্ঞান কেমন করে হবে ? অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়গুলি হল 'অক্ষ', এথেকে যা 'পর' তাঁর জ্ঞান কী করে হবে ? এটি তো এক প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া অনুসারে চলাও ঠিক। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে বিবেক, বৈরাগ্য, ষটসম্মতি, মুমুক্ষা—এই সাধন-চতুষ্টয়ের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তারপর শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন করবেন। এরপর তত্ত্বপদার্থ সংশোধন করবেন। এটি দীর্ঘ পথ। এতে তাৎক্ষণিক সিদ্ধি হয় না।

শ্রোতা—মহারাজ ! আপনি বলেছেন যে আমরা শরীর নই, শরীর আত্মা থেকে ভিন্ন। আপনি বলায় এটি আমি মেনে নিয়েছি।

স্বামীজী—এটি মানা নয় বাবা, এটি হল শেখা। আমার কথা মনে

রাখবেন যে এটি মানা নয়। অনুভূতি যদি নাও হয়, মান্যতা দৃঢ় হওয়া চাই। যেমন, নারদের উপদেশের প্রতি পার্বতীর দৃঢ় মান্যতা ছিল—

জন্ম কোটি লগি রগর হমারী। বরউঁ সম্ভু ন ত রহউঁ কুআরী॥
তজউঁ ন নারদ কর উপদেসূ। আপু কহঁহি সত বার মহেসূ॥
(রামচরিতমানস ১।৮১।৩)

ভগবান শংকর বললেও নারদের উপদেশ ছাড়ব না। ভগবান ভুল করতেও পারেন, কিন্তু নারদের ভুল হতে পারে না। একেই বলা হয় মান্যতা। শরীর এবং আমি দুটি ভিন্ন। স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি বলেন যে শরীর আর তুমি এক—তাহলে তাঁর ভুল হতে পারে। কিন্তু আমার হতে পারে না। আমরা যদি বুঝতে পারি তাহলেও কথাটি তাই। এই রকম দৃঢ় মান্যতা জ্ঞানের মতো উদ্ধার করতে পারে। এটি পরোক্ষ নয়। আপনারা বিবাহ করে স্ত্রীদের নিজেদের বলে মেনে নিয়েছেন। এখন এতে কোনো সন্দেহ আছে কি ? বিপরীত কোনো ধারণা হয় কি ? বলুন, মেনে নেওয়া ছাড়া এতে আর কী আছে ? স্ত্রী সতী হয়ে যায়, আগুনে পুড়ে মরে—কেবল মান্যতার কারণে। পুড়লেও আগুনকে খারাপ বলে মনে হয় না।

ইকানোরা হরদৌঈ জেলার একটি গ্রাম। সেখানে সম্প্রতি একজন সতী হয়েছেন। করপাত্রীজী মহারাজ জানিয়েছেন যে তিনি নিজে সেখানে গিয়েছেন এবং তাদের কথা শুনেছেন। স্বামী দূরে ছিলেন এবং মেয়ে তার মামার কাছে ছিল। সে তার স্বামীর অসুস্থতার কথা শুনেছিল। পরে তার মনে হয়েছিল যে তাঁর স্বামী মারা গিয়েছে। তখন তাকে তাড়াতাড়ি সেখানে নিয়ে যেতে বলেছিল। তারপরে বলেছিলে যে সেখানে সে আর পৌঁছাতে পারবে না, কেননা তার দাহক্রিয়া আগেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। ওইখানেই সে সতী হবে। সকলে তাকে এরকম করতে বারণ করেছিল। তখন রাত্রি। প্রদীপ জ্বলছিল। সে প্রদীপের আগুনে আঙুল দিয়েছিল। সেই আঙুল মোমের মতো

জ্বলছিল। সে বলেছিল, আমাকে যদি এখানে রাখ তাহলে তোমাদের বাড়ি পুড়ে যাবে। তাই আমাকে বাইরে যেতে দাও। তারা বলেছিল, ঠিক আছে তোমাকে যেতে দেব। তখন সে দেওয়ালে ঘষে আঙুলের আগুন নিভিয়েছিল। কারপাত্রজী বলেছেন যে যেখানে আঙুল ঘষেছিল সেই জায়গা তিনি দেখে এসেছেন। দেওয়ালে তার চিহ্ন রয়েছে। মেয়েটির বাড়ির লোকেরা তাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল এবং বলেছিল যে তারা কাঠ বা আগুন দেবে না। তা করলে লোকেরা পুড়িয়ে দিয়েছে এই ঝামেলা সৃষ্টি করবে। সে ভগবান সূর্যের কাছে আগুনের জন্য প্রার্থনা করেছিল। সে সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় পুড়ে গিয়েছিল। পাশেই ছিল অশত্থ গাছ, সেটিরও অর্ধেক পুড়ে গিয়েছে। সেখানকার মুসলমানরা বলেছেন যে তাঁরা এটি দেখেছেন। এখন বলুন যে এতে কী জ্ঞান রয়েছে ? তিনি চলে গিয়েছেন, এখন আমি আর থাকতে পারি না। আমি তো তাঁরই অংশ। তাঁর দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, আমার কেন হবে না ? একেই বলে মান্যতা। শুনলাম আর শিখলাম, এর নাম মান্যতা নয়। তার নাম শেখা। শিখে নিয়ে খুবই বক্তৃতা দেওয়া হয়, অনেক বই লেখা হয়।

জ্ঞান হয় অপরোক্ষ, পরোক্ষ হয় না। আমি এ নিয়ে চিন্তা করেছি। এর বেশি আমি আর কী বলব ? একেবারে তখনই সিদ্ধিলাভ হয়, এ হল সেরকম কথা। আর একটি কথা বলছি। আপনাদের স্বীকৃতিতে আপনাদের লাভ। না আমার স্বীকৃতিতে আপনাদের লাভ ? আপনাদের লাভ কীসে ? আপনারা এখন পরোক্ষ-অপরোক্ষ নিয়ে বসে আছেন—এই মান্যতায় লাভ, না আমি যা বলছি তাতে লাভ ? কীসে লাভ তাও আপনারা বোঝেন না ! যদি প্রতারণাই হয় তো বলুন দেখি আজ পর্যন্ত কোন কাজটি ভালো হয়েছে ? প্রতারিতই হয়েছেন এতদিন। আমার কথায় না হয় আর একটি প্রতারণা হোক ! কিন্তু আমি বলছি যে এতে প্রতারণা হবে না, হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়। পূর্ণ সত্য কথা।

পং ডরপুরে যখন চাতুর্মাস[১] করছিলাম তখন বলেছিলাম যে সিদ্ধি তাৎক্ষণিক হয়ে যায়। শ্রোতারা অনেকেই বলেছিলেন, তা হয় না। অহঙ্কারের কথা। আমি জোরের সঙ্গে বলেছিলাম যে মারাঠী ভাষা আমি জানি না, আর এখানকার সন্তদের লেখাও আমি পড়িনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে একনাথ মহারাজ, তুকারাম মহারাজ, জ্ঞানেশ্বর মহারাজ প্রমুখ এখানকার অভিজ্ঞ সন্তদের লেখায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধির কথা নিশ্চয় আছে। তাঁদের বাণীতে এমন কথা নেই, তা হতেই পারে না। তখন একজন বলেছিলেন যে অমুক অমুক জায়গায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধির কথা আছে।

গীতা বলেছে—**'অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।'** এটি মেনে নিন। এই কথায় কোনো সন্দেহ করবেন না। অন্তঃকরণ অশুদ্ধ হলেও জ্ঞান হতে পারে। অন্তঃকরণ সর্বতোভাবে শুদ্ধ হয়ে গেলে আর বাকি কী থাকল ? অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করা আর অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা—দুটি স্বতন্ত্র বিষয়। খুব জোরের সঙ্গেই বলছি অন্তঃকরণকে নিজেদের মনে করে শুদ্ধ করতে চাইলে তা হবে না। কেন ? আমার অন্তঃকরণ—এরূপ ধারণা পোষণ করাই হল মূল অশুদ্ধি। গোস্বামীজী (তুলসীদাস) মমতাকে মল বলেছেন—**'মমতা মল জরি জাই'** (রামচরিতমানস ৭।১১৭ক)। মল লাগিয়ে ধুলে, শুদ্ধ করলে তা শুদ্ধ হবে কি ? মমতা রাখলে অর্থাৎ 'অন্তঃকরণ আমার'—এটিকে আঁকড়ে থাকলে অন্তঃকরণ কখনোই শুদ্ধ হবে না ! গীতাও মমত্ব ত্যাগ করতে বলেছেন—**'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি'** (২।৭১)।

---

[১]বর্ষাকালে সাধু-সন্তরা পরিভ্রমণ না করে কেউ কেউ দুই মাস, কেউ তিন মাস বা কেউ চার মাস ধরে একই স্থানে অবস্থান করেন।